তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে...



مؤسسة الصوارم
As Sawarim Media
ASSAWARIM

তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে...

পরিবেশনায়ঃ আস-সওয়ারিম মিডিয়া



তালেবান ও আল-কায়দার স্বরূপ সন্ধানে...

পরিবেশনায়ঃ আস-সওয়ারিম মিডিয়া

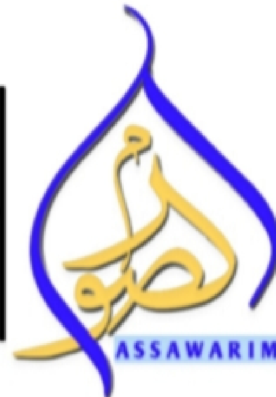
প্রথম প্রকাশঃ

শা'বান ১৪৪৫ হিজরী

মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

مؤسسة الصوارم

As Sawarim Media



উৎসর্গ

**এই শতাব্দীর জিহাদের মহান অগ্রপথিক
শাইখুল মুজাদ্দিদ উসামা বিন লাদিন (রহিঃ) এবং
আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা ওমার (রহিঃ) এর
প্রতি...**

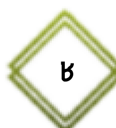


مؤسسة الصوارم
As Sawarim Media

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ

তালেবান প্রসঙ্গঃ





إن الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

পৃথিবীব্যাপী অনেক দল আত্মপ্রকাশ করেছে। যারা নিজেদেরকে দ্বীন ও ইসলামের সাথে নিসবত করে। যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলে, জিহাদের স্লোগান দেয়, মুসলিমদের প্রতিরক্ষা করবে বলে বুলি আওড়ায়। ঐ সমস্ত দল মাজলুমদের সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দেয়। অনেক দল বা জামাআত আছে যারা জিহাদ করতে চায় তাওহীদকে এক পাশে রেখে। কেউ কেউ আবার দ্বীন কায়েম করতে চায় ‘ওয়ালা বারা’কে পেছনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে। শয়তান তাদের কুকর্মগুলোকে তাদের কাছে সুশোভিত করে তোলে। এ কারণেই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। শিরক কুফরের মত আল্লাহর বড় বড় নাফরমানিতে লিপ্ত হয় এরপর ঐ সকল কুকর্মের বিভিন্ন মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে সেগুলোকে ভাল কাজ হিসেবে জাহির করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। একে তো তারা অপকর্ম করে এবং সাথে সাথে উক্ত অপকর্মকেই আবার নেক কাজ মনে করে। এভাবেই তারা ভ্রষ্টতার ষোলকলা পূর্ণ করে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, “পার্থিব জীবনে যাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে অথচ তারা মনে করে যে, তারা অনেক ভালো কাজ করছে।”[1]

বিদ্যমান বিভিন্ন দলের মধ্যে এখানে আমাদের আলোচনায় স্থান পাবে তালেবান এবং তালেবানের অনুসারী আল-কায়দার বিষয়টি। তালেবান আল-কায়দা সহ প্রতিটি দল-ই নিজেদেরকে হক্বপন্থি মনে করে বিশেষত জিহাদপন্থী দলগুলোও। কিন্তু আল্লাহর রাসুল ﷺ হক্বপন্থি দলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে গেছেন। রাসুল ﷺ বলেছেন, “আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! সে দল কোনটি? তিনি বললেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।”[2] সুতরাং এখানে মূল হচ্ছে রাসুল ﷺ এবং তার সাহাবীগণের পথের উপর চলা। তাই আমরা যদি

[1] সুরা কাহাফঃ ১০৪

[2] তিরমিযীঃ ২৬৪১

প্রত্যেকেই নিজেদেরকে নিজেদের মনগড়া মানদণ্ড দিয়ে যাচাই না করে কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে যাচাই করি, আমাদের কর্মগুলোকে সাহাবীগণের কর্মের উপর ক্বিয়াস করি তাহলে-ই আমরা নিজেদের অবস্থান এবং কর্মপদ্ধতি শাশ্বত ওহীর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ কিনা তা জানতে পারব। আমরা যদি আল্লাহর রাসুল ﷺ এর সুন্নাহ'কে আঁকড়ে ধরি তাহলে অবশ্যই আমাদের মধ্যে বিভক্তি আসবে না। রাসুল ﷺ বলেছেন, "নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্য থেকে যে আমার পরে জীবিত থাকবে অচিরেই সে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। (সে সময়) তোমাদের উপর আবশ্যক হল আমার সুন্নাহ ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদাহ'র সুন্নাহ'কে আঁকড়ে ধরা। তোমরা তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। দ্বীনের মাঝে নতুনত্ব (বিদআত) থেকে তোমরা সাবধান থাকবে! কেননা প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।"[3] সুতরাং প্রথমত আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে রাসুল ﷺ এর সুন্নাহ'কে আঁকড়ে ধরা এরপর খুলাফায়ে রাশিদাহ'র সুন্নাহ'কে আঁকড়ে ধরা। আর তারা হলেন, মুরতাদদের সাথে অনমনীয় আচরণকারী আবু বকর সিদ্দীক, অর্ধ জাহান শাসনকারী ওমার, নিজের জীবন উৎসর্গকারী উসমান এবং চরমপন্থীদের দমনকারী আলী বিন আবী তালিব।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম হয় শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله এর প্রতিষ্ঠিত আল-কায়দা নামক দলটির। যা মূলত আরব ও অনারব মুহাজির এবং আনসারদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল, যারা সকলে প্রকৃতপক্ষেই সালফে সালেহীনদের অনুসরণ করতেন। এরও কিছুদিন পর গঠিত হয় হারাকাতে তালেবান নামক দলটি। এরপর কোন একপর্যায়ে তালেবান ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলে নিতে সক্ষম হয়।[4] তালেবান ইমারাহ গঠন করে। তালেবান তাদের ইমারাহ'এ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মুহাজিরগণকে আশ্রয় দেয় এবং পৃথিবীব্যাপী জিহাদের শিখা প্রজ্বলিত করতে

[3] আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবঃ ৩৭

[4] এক্ষেত্রে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই তালেবানকে সাহায্য করেছিল।

সহায়তা করে। মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার رحمه الله এর নেতৃত্বাধীন তালেবান সকল মুসলিমদের ভালবাসা ও আবেগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ২০০১ সালে নাইন ইলেভেনের বরকতময় হামলার পর আমেরিকা মোল্লা ওমার رحمه الله কে চাপ দিতে থাকে শাইখ উসামা رحمه الله কে আমেরিকার কাছে তুলে দেওয়ার জন্য। তখন মোল্লা ওমার رحمه الله আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এই উম্মাহ'র সামনে। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করতে গিয়ে একটি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ইমারাহ'কে কুরবান করে দেন। ত্যাগ-তিতিক্ষার এক অনন্য নযির স্থাপন করেছিল তৎকালীন তালেবান। তখন তালেবানের নেতৃত্বে ছিল আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কিছু ব্যক্তি। যার প্রমাণ মেলে তাদের কার্যক্রমে। একদা তালেবানের সেই সময়ের সামরিক কমান্ডার মোল্লা দাদুল্লাহ رحمه الله এর আস-সাহাব মিডিয়াকে দেওয়া এক বক্তব্যও তাদের আত্মমর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে।

আস-সাহাব মিডিয়ার পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়, *"নিউজ এজেন্সি কাবুল সরকারের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছে যে, সরকার তালেবানের সাথে যুদ্ধ বিরতির চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করছে, আসলে এই দাবির বাস্তবতা কী?"*

মোল্লা দাদুল্লাহ رحمه الله বলেন, "তালেবানের সাথে তাদের আলোচনার এই দাবি প্রকৃতপক্ষে একটি মিথ্যা দাবি। কোন ব্যক্তিই এই আলোচনা করতে পারে না ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে পরিপূর্ণরূপে লজ্জাশরম ছাড়া এবং যার কোন গাইরত (আত্মমর্যাদা) নেই। বিশেষকরে এমন সময় যখন আমাদের জানা আছে যে, আমাদের মা-বোন তাদের জেলে বন্দি রয়েছে আর তাদের বেইজ্জতি করা হচ্ছে। তাহলে কিভাবে আমেরিকানদের সাথে এবং তাদের দোসরদের সাথে আলোচনা করা যায়? না না, এটা কখনোই সম্ভব না। ওরা তো ঐ সমস্ত লোক যারা আমাদের বন্দি ভাইদের উলঙ্গ করে নির্যাতন চালায়। আমাদের রাসুলুল্লাহ ﷺ কে অপমান করে। আমাদের আযিমুশ-শান কুরআনকে অপমান করে। আমাদের দ্বীন এবং উলামায়ে কেরামকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে। তাদের জেলে আমাদের পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হয়। ফের এতো কিছুর পরেও কি

আমরা ওদের সাথে আলোচনা করব? এটা তো এমন কথা যা আক্বলই সহ্য করে না, আর না একে কবুল করা যায়! সুতরাং সাক্ষী থাকুন, যে কেউই এই আলোচনা করবে আমেরিকানদের সাথে সাথে তার মাথাও কেটে ফেলব ইনশা'আল্লাহ।"[5]

কিন্তু আজ তালেবানের এ চিত্র বদলে গেছে। পরিস্থিতি পালটে গেছে অনেক খানি। বদলে গেছে তালেবানের পরবর্তী নেতৃত্ব, সাথে সাথে বদলেছে তালেবানও। আমরা জানি যে, অনেক দলই শুরুতে হক্বপন্থি হিসেবে পথচলা শুরু করলেও পরবর্তীতে তাদের পদস্খলন পরিলক্ষিত হয়েছে। তালেবানের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি ঘটেছে। মোল্লা ওমার ﷺ সহ আরো কিছু মুখলিছ নেতৃবর্গের মৃত্যুর সাথে সাথে বদলে যেতে থাকে তালেবান। যদিও তালেবান মোল্লা ওমার ﷺ এর মৃত্যুর তারিখ ২০১৩ সালের কথা বলেছে। তথাপি অনেকেই মনে করেন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার আরো কয়েকবছর আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আর এর প্রমাণ মেলে শাইখ উসামা এবং আবু ইয়াহইয়া ﷺ এর চিঠিতে। যখন তালেবানের পক্ষ থেকে বিচ্যুতি প্রকাশ পেতে থাকে তখন শাইখ উসামা ﷺ ১৪৩১ হিজরী সনের ২৭ ই যুল-হাজ্জ মাসে রোজ শুক্রবার মোল্লা ওমার ﷺ এর নিকট একটি চিঠি প্রেরণ করেন সেখানে তিনি মোল্লা ওমার ﷺ কে অডিও বক্তব্য দেওয়ার আহ্বান জানান। তালেবান সুকৌশলে এ সকল বিচ্যুতিমূলক বিবৃতি মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার ﷺ এর নামে প্রকাশ করত। তখন শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিব্বী ﷺ ১৪৩১ হিজরী সনের ৯ ই সফর মোতাবেক ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শাইখ উসামা ﷺ এর নিকট প্রেরিত চিঠিতে বিষয়গুলো তুলে ধরেন। আমরা শাইখের চিঠির বক্তব্যের হুবহু অনুবাদ তুলে ধরছি। তিনি বলেন, "দ্বিতীয়তঃ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির একটি হল, আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারতের সাথে আমরা সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করব—আল্লাহর প্রশংসায় এটা খুবই ভালো কাজ। কিন্তু শেষ সময়গুলোতে কিছু উপলক্ষ যেমন ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিসমূহে এমন কিছু পরিভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে যেগুলো তাদের মাঝে রীতিসিদ্ধ এবং পরিচিত ছিল না। অথচ এই বিবৃতিগুলো আমীরুল মু'মিনীন حفظه الله-

[5] আস-সাহাব মিডিয়াকে দেওয়া মোল্লা দাদুল্লাহ'র ইন্টার্ভিউ

এর নামে প্রকাশিত হচ্ছে। তথাপি আমি মনে করি, এই বিবৃতিগুলোর বাস্তবতা তার পদ্ধতি, তার মত ও তার ভাষা থেকে যোজন যোজন দূরে। হতে পারে মাজলিসু শুরার ক্ষমতাবলে তার নামে বিবৃতিগুলো প্রকাশ করা হয়।” এরপর শাইখ আবু ইয়াহইয়া মোল্লা ওমার رحمه الله এর সাথে যোগাযোগ ত্বরান্বিত করার মত দেন।[6]

সুতরাং আমরা জানলাম যে, তালেবানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিগুলোর ব্যাপারে আল-কায়দার শাইখরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। আর তারা জানতেন, এই ধরনের বিচ্যুতি মোল্লা ওমার رحمه الله এর পক্ষ থেকে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তো শাইখ উসামা মোল্লা ওমার رحمه الله এর কণ্ঠ শোনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। আর তালেবান এই ধরনের বিচ্যুতিমূলক বিবৃতি ২০০৭ সালের শেষ থেকে প্রকাশ করা শুরু করে। বলে রাখা ভালো যে, ২০০৭ সালেই তালেবান আমেরিকার সাথে গোপনে আলোচনা শুরু করে এবং এজন্য শের আব্বাস স্টানিকজাইকে দায়িত্বশীল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।[7] কেউ কেউ মনে করেন, আমেরিকা হামলা করার কয়েক বছরের মাথায় মোল্লা ওমার رحمه الله মৃত্যুবরণ করেছেন। আর আমরা জানি যে, মোল্লা ওমার رحمه الله এর মৃত্যুর সংবাদ তালেবান প্রথমে প্রকাশ করেনি। যখন তালেবানকে বলা হয় মোল্লা ওমার رحمه الله কে প্রকাশ করতে তখন তালেবান চাপে পড়ে বিষয়টি স্বীকার করে বলে যে, ২০১৩ সালে মোল্লা ওমার رحمه الله মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা সকলেই একটি বিষয় জানি যে, যখন কোন হক্ব জামাআত বা দল পথভ্রষ্ট হয় তখন সেই দল ক্রমান্বয়ে ভ্রষ্টতার দিকে অগ্রসর হয়। এরপর আস্তে আস্তে হারিয়ে যায় ভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে। যদিও ভ্রষ্টতায় লিপ্ত বা রিদ্দায় পতিত কোন দল দ্বীন প্রতিষ্ঠার কথা বলে কিন্তু বাস্তবে তারা তাদের বাতিল চিন্তা চেতনা এবং শিরকী-কুফরি কর্মকাণ্ডকে ইসলামের নামে বাস্তবায়ন করে। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, চলমান বিষয়গুলোকে কুরআন-সুন্নাহ’র শাশ্বত মানদণ্ডে যাচাই

---

[6] এই চিঠি এবোটাবাদ নথিপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। আর এবোটাবাদ নথিপত্র ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরী সত্যায়ন করেছেন।

[7] শের আব্বাস স্টানিকজাই নিজেই আফগানিস্তানের টোলো নিউজকে দেওয়া এক ভিডিও সাক্ষাতকারে বিষয়টি বলেছে।

করে পদক্ষেপ নিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন। আমীন!

সবারই দাবি দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা তবে কেন আমরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ নই?

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, দাওলাতুল ইসলাম যমীনে শারীয়াহ বাস্তবায়নের কথা বলে, তালেবান আল-কায়দাও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে, তাহলে সবারই দাবি দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা তবে কেন আমরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ নই? সবারই দাবি দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। তালেবান আল-কায়দাও দ্বীন প্রতিষ্ঠার কথা বলে আমরাও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করি। আল-কায়দা তাওহীদে হাকিমিয়্যাহ'র দিকে আহ্বান করে, আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র দিকে আহ্বান করে, আমরাও তাওহীদে হাকিমিয়্যাহ'র দিকে ও আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র দিকে আহ্বান করি। কিন্তু আমরা তাদের দাবি ও বাস্তবতার কোন মিল খুঁজে পাইনি। উদাহরণ স্বরূপ দেখাতে পারি লিবিয়ায় আল-কায়দার শাখা যা আনসারুশ শারীয়াহ নামে পরিচিত। যাদের বড় অংশটিই খিলাফাহ'র পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে কিন্তু যারা খিলাফাহ'র ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হয়নি তারা তাগুত খলীফা হাফতার ও অন্যান্য মিলিশিয়া গোষ্ঠীর সাথে জোট বেঁধে দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধ করেছিল। জাতীয়তাবাদী উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ এই সরকারের সাথে মিলে ক্ষমতায় গিয়েছে এবং শাসন করেছে। এটা কোন ধরনের ওয়ালা? কেউ কি আমাকে কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে এমন ওয়ালার দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন? হায় আফসোস যদি তারা তাদের দাবি অনুযায়ী আমল করতো! এক কথায় বলতে পারি, প্রকাশ্যে দাবি এক হলেও আসলে বাস্তবতায় দেখা যায় আক্বীদাহ এবং মানহাজে রয়েছে বিস্তর ফারাক। যেহেতু জিহাদের দাবিদারদের মাঝে আক্বীদাহ এবং মানহাজের অনেক পার্থক্য রয়েছে তাই আমাদের সামগ্রিক প্রচেষ্টা এক হওয়া সম্ভবই না। কখনোই সম্ভব না। যারা জনগণের সন্তুষ্টির পেছনে দৌঁড়ায় তাদের প্রচেষ্টা ও আমরা যারা স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করি যদিও সৃষ্টি ক্রোধান্বিত হয়—আমাদের প্রচেষ্টা কি এক ও অভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন আক্বীদাহ-মানহাজের অনুসারী দলগুলোর এক

ও অভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়। আর তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। আক্বীদাহ ভিন্ন হওয়ার কারণে লক্ষ্যও ভিন্ন হয় এবং বাস্তবিক অর্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। আর দ্বীন ত্যাগী তালেবান - কারো কারো ধারণা অনুযায়ী তারা পুরো পৃথিবীব্যাপী জিহাদের নেতৃত্বদানকারী - কখনোই তাদের মানহাজ স্পষ্ট করেনি। বর্তমান তালেবানের কর্মকাণ্ড থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাদের আক্বীদাহ'তে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র কোন স্থান নেই। আবার তারা শিরকী সূফী আক্বীদায় বিশ্বাসী। অনৈসলামিক ইমারাতের আমীর হাইবাতুল্লাহ আখন্দজাদা ত্বরীকায়ে নকশাবন্দীয়ার একজন খলীফাহ। তালেবান প্রধান যে নকশাবন্দী ত্বরীকার খলীফাহ এব্যাপারটি জানিয়েছে কাবুলে উলামা পরিষদের সভাপতি খলীফা দ্বীন মুহাম্মাদ। এই খলীফাহ দ্বীন মুহাম্মাদই সিরাজ উদ্দিন হক্কানীর পীর ও মুরশিদ। দ্বীন ত্যাগী তালেবানের অনেক আলেমই হুলুলিয়্যাহ আক্বীদায় বিশ্বাসী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য–তালেবান যাকে শামসুল মাশাইখ উপাধি দিয়েছে সে হল কাবুল উলামা পরিষদের সভাপতি খলীফা দ্বীন মুহাম্মাদ এবং আব্দুর রহীম প্রমুখ। আমরা তালেবানকে দেখি দেশাত্মবোধ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ওয়ালা করে – যেমন একজন মুসলিম যদি আফগানিস্তানে আসে তাহলে সে পরিপূর্ণরূপে একজন আফগান নাগরিকের অধিকার পাবে না। সে তালেবানের নিকট ভিনদেশী। আর এক রাফিদী মুশরিক যে আফগানিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছে এবং তথায় বসবাস করে সে আফগানিস্তানের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। তার জন্য রাষ্ট্রের সকল অধিকার প্রযোজ্য হবে। প্রিয় ভাই! আমরা এই স্থানে আলোচনা দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না। কারণ আমরা আপনাদের কাছে তালেবানের যে কর্মকাণ্ডগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করেছি এর উপর ভিত্তি করেই দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, জিহাদের দাবিদার (যদিও তালেবানের দাবি অনুযায়ী তাদের জিহাদ শেষ) তালেবান এবং আমাদের (দাওলাহ) দাবী এক নয়। পরিবর্তিত এই তালেবান কখনোই আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র দিকে আহ্বান করেনি। তাহলে তারা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র দিকে আহ্বানকারী নয়। তারা শুধু আফগান থেকে বহিঃশত্রু হটানোর জন্য লড়াই করত। বিপরীতে আমরা যুদ্ধ করি পুরো পৃথিবীতে আল্লাহর শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাহলে কি তাদের দাবি আর আমাদের দাবি এক? কস্মিনকালেও দাবি এক নয়।

দাওলাতুল ইসলাম কি শিরকী সূফি মতবাদে বিশ্বাসী? দাওলাহ কি হুলুলিয়্যাহ আক্বীদায় বিশ্বাসী? তাহলে আমরা কিভাবে উল্লেখিত শিরকী, কুফরি ও ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী দলের সাথে এক হব? এক হওয়া তো সম্ভবই না বরং দ্বীন পরিপূর্ণ আল্লাহর জন্য না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাদের সাথে লড়াই চালিয় যাওয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লহ ﷻ বলেন,

﴿وَ قَاتِلُوۡهُمۡ حَتّٰی لَا تَکُوۡنَ فِتۡنَۃٌ وَّ یَکُوۡنَ الدِّیۡنُ کُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ﴾

“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।”[৪]

সুতরাং তালেবান দ্বীন প্রতিষ্ঠার কথা বললেও বাস্তবে সেখানে মুহাম্মাদে আরাবী ﷺ যে দ্বীন সহকারে প্রেরিত হয়েছেন তা বাস্তবায়িত নয়।

পক্ষান্তরে তালেবানের শাসনাধীন আফগানিস্তানে উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা رضي الله عنها কে অপবাদ আরোপকারী এবং সাহাবীদের অভিসম্পাতকারীদের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত, সেখানে শিরকী সূফীবাদের দ্বীন বাস্তবায়িত। তাই তালেবানের দ্বীন প্রতিষ্ঠার দাবি অবান্তর দাবি বৈ কিছু নয়। প্রিয় পাঠক! আপনিই বলুন, যারা আম্মাজানকে গালি ও অপবাদ আরোপকারীদের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত, কোন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি কি তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে? আমরা কি এমন কোন গোষ্ঠীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হব যারা উইঘুরে মুসলিমদের নির্যাতনকারীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে?

এ লড়াই আক্বীদাহ’র লড়াই এ লড়াই হক্ব বাতিলের লড়াইঃ

দীর্ঘদিন ধরেই আল-কায়দা তালেবান ও দাওলাতুল ইসলামের মাঝে বিরোধ চলছে। বর্তমানে তা অনেক রক্তক্ষয়ী আকার ধারণ করেছে। সাধারণ মুসলিমদের

[৪] সুরা আনফালঃ ৩৯

অনেকেই মনে করে থাকেন যে, দাওলাতুল খিলাফাহ'কে মেনে না নেওয়াটাই হয়তো এই লড়াইয়ের মূল কারণ। আবার কেউ মনে করেন যে, অমুক দল বা অমুক দল প্রথমে আক্রমণ করাই মূলত চলমান এই বিরোধের মূল কারণ। আসলে এর পূর্বেও মুসলিমদের মাঝে অনেক সংঘর্ষ হয়েছে বিভিন্ন কারণে। আমরা ঐ সকল লোকদের বলতে চাই যারা আল-কায়দা তালেবানের সাথে দাওলাতুল ইসলামের চলমান এ লড়াইয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল না।

এ লড়াই কোন একজন খলীফাহ'কে মেনে নেওয়া বা বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে সৃষ্ট লড়াই নয়। বরং আমাদের ও আল-কায়দা তালেবানের মাঝে চলমান এ লড়াই মূলত আক্বীদাহ'র লড়াই, প্রকৃতপক্ষে এ লড়াই হক্ব এবং বাতিলের লড়াই। আমাদের সাবেক মুখপাত্র শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী رحمه الله অনেকবার বলেছেন যে, 'দাওলাহ এবং আল-কায়দার মধ্যে দ্বন্দ্ব কে কাকে বাইআত দিল আর কে কার বাইআত ভঙ্গ করল তা নিয়ে নয় বরং আমাদের দ্বন্দ্ব হল মানহাজগত দ্বন্দ্ব'। সম্মানিত ভাই! আমি ইতোপূর্বেই বলেছি তালেবান আল-কায়দার সাথে দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের বিষয়টি শুধুমাত্র এভাবে বোঝা যাবে না যে, কে আগে যুদ্ধ শুরু করেছে? বা তালেবান আল-কায়দার পক্ষ থেকে খিলাফাহ মেনে নেয়নি। বর্তমানের যে পরিবর্তিত তালেবান আল-কায়দাকে দেখছেন—এর আক্বীদাহ-মানহাজ যখন আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করব তখনই আপনারা সহজে বুঝে ফেলবেন যে, এ লড়াই আক্বীদাহ'র লড়াই। এ লড়াই মানহাজের লড়াই। এ লড়াই হক্ব বাতিলের লড়াই। ব্যাপারটি আর কেবলই যুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং এর চেয়ে হাজারগুণ বড় ফিতনা গ্রাস করল তালেবান ও তালেবানের অনুসারী আল-কায়দাকে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র মত মহান আক্বীদাহ'কে ধ্বংস করেছে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা আম্মাজান আয়িশা رضي الله عنها কে গালিদাতা এবং অপবাদ আরোপকারীদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা আবু বকর, ওমার, উসমান رضي الله عنهم সহ অধিকাংশ সাহাবীগণকে তাকফীরকারী এবং লা'নতকারীদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা উইঘুরে মুসলিমদের নির্যাতনকারী এবং

রাখাইনে মুসলিমদের নির্যাতনকারীদের মদদদাতা চীনের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা আল্লাহর রাসুল ﷺ কে নিয়ে ব্যঙ্গ ও কটূক্তিকারী ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায়। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা দিবসে স্বাধীনতা সৌধে ফুলেল শ্রদ্ধা জানায়–শারয়ী বাক্যে এভাবে বলা হবে, যারা খাম্বা পূজা করে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা ICC ক্রিকেট খেলার বৈধতা দেয়। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা জাযিরাতুল আরবে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ সফলভাবে আয়োজনের জন্য কাতারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা আফগান, শাম, সোমালিয়ায় মুসলিমদের হত্যাকারী তাগুত এরদোগানকে মহান মুসলিম আলেম হিসেবে আখ্যায়িত করে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা শিরকী চিহ্ন ও স্থাপনাসমূহ রক্ষা করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে–ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের বাহনা দিয়ে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে আহ্বান করে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা মুরতাদদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা বারো ইমামে বিশ্বাসী রাফিদীদের হত্যা করার কারণে নিন্দা জ্ঞাপন করে।

যেহেতু তারা ফিতনাগ্রস্থ হয়েছে, তাই এ লড়াই আক্বীদাহ’র লড়াই। আর এই সমস্ত আক্বীদাগত পদস্খলনের কারণে কোনভাবেই চলমান এই সংঘাত বন্ধ হবার নয়। যতক্ষণ না তারা শিরক এবং কুফরের মত ভ্রষ্টতা পরিত্যাগ করে সীরাতে মুস্তাকীমের দিকে ফিরে আসে। কারণ আমাদের এই লড়াই আক্বীদাহ’র লড়াই।

তালেবানের সাথে দাওলাহ’র যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপটঃ

দাওলাতুল ইসলামের পক্ষ থেকে শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী আল-কুরাইশী رحمه الله কে মুসলিম উম্মাহ’র খলীফাহ হিসেবে ঘোষণা করার পর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিমগণ বাইআত প্রদান করতে শুরু করেন। খুরাসানের ভূমি থেকে বেশ কিছু সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে আবু বকর আল-বাগদাদী رحمه الله কে বাইআত

প্রদান করে। দাওলাতুল ইসলাম প্রতিটি শাখার নেতৃত্বকে জিহাদের দাবিদারদের সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করে। এর থেকে বাদ যায়নি খুরাসান শাখাও। আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হয়ে খুরাসান শাখার মুজাহিদগণ কেবল আমেরিকা ও তাগুত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু তালেবানের তৎকালীন আমীর মোল্লা আখতার মানসুর বাগী ও খারিজি অপবাদ দিয়ে দাওলাহ'র মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অনেকেই মনে করে থাকে যে, খুরাসানে তালেবানের বিরুদ্ধে বুঝি দাওলাহ'র শাখা-ই প্রথমে যুদ্ধ শুরু করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে খারিজি ও বাগী দমনের স্লোগান তুলে তালেবানই প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই তো হারাকাতে ইসলামিয়্যাহ লি-উজিবেকিস্তান। কী অপরাধ ছিল তাদের? তালেবান কেন তাদের উপর হামলা করেছে? তারা কি তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল বা তালেবানের কাউকে হত্যা করেছিল? কখনোই না। কিন্তু এরপরেও তালেবান এই উজবেক মুজাহিদগণের উপর হামলা করেছে এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানসহ নির্বিচারে অনেককে শহীদ করেছে। আর তালেবান তাদের এই অপকর্ম নিজদের ওয়েবসাইটে গর্বভরে প্রকাশ করেছে। সুতরাং খুরাসানের ভূমিতে তালেবানের বিরুদ্ধে দাওলাহ যুদ্ধ শুরু করেনি। বরং দাওলাতুল ইসলাম অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় খুরাসানেও প্রতিরক্ষা করে চলেছে। কেউ কেউ বলে, সম্প্রতি সময়ে দাওলাতুল ইসলাম কী কারণে আফগানিস্তানে তালেবানের উপর হামলা করছে? তাদেরকে আমরা বলি, তালেবান কী কারণে পূর্বের সরকার কর্তৃক কারাবন্দী দাওলাহ'র সৈনিকদের হত্যা করেছে? কী কারণে কোন ভবনে দাওলাহ'র সৈনিকদের উপস্থিতি জানা মাত্রই সেই ভবন ঘেরাও করে বিস্ফোরক দিয়ে গুড়িয়ে দিচ্ছে? সেই ভবনে মুসলিম নারী-শিশু থাকার বিষয়টি তাদের নিকট বিবেচ্য হয় না কেন? কেন মুসলিম নারী-শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা নির্মমভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াটাও অনৈসলামিক ইমারাতের সৈন্যদের নিকট বিবেচ্য বিষয় নয়! কেবল বিবেচ্য হল বিস্ফোরক বা রকেট লাঞ্চার দিয়ে সেই ভবন গুড়িয়ে দেওয়া। দাওলাহ'র সৈনিকদের স্ত্রী-সন্তানকেও তালেবান হত্যা করছে! দাওলাহ'র প্রতি তালেবানের কেন এতো বিদ্বেষ? তালেবান যে দাওলাহ'র সৈনিকদেরকে স্ত্রী-সন্তানসহ হত্যা করছে এটা অনেকেরই অজানা। এই তো ২০২১ সালে তালেবান কাবুলের ক্ষমতা

ফিরে পাওয়ার পরের দিন দাওলাহ'র একজন দায়িত্বশীলকে প্রকাশ্যে হত্যার মাধ্যমে নতুন করে তালেবান দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। সুতরাং শুরুটা তালেবানের পক্ষ থেকেই হয়েছে। আর যে শুরু করে সেই অধিক জালিম।

তাওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলাফলঃ

এই শতাব্দীর জিহাদী দলগুলো আদর্শিকভাবে ঐক্যবদ্ধই ছিল–যদিও একেক দলের আমীর ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন জন। তবে হ্যাঁ, মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তাওহীদের ভিত্তিতে এবং ঈমানের ভিত্তিতে। এমন ঐক্যবদ্ধতা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে না যার ভিত্তি হবে না তাওহীদ এবং ঈমান। আমরা দেখেছি, ৮০ এর দশকে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে হটানোর জন্য আফগানিস্তানে থাকা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমরা সেকুলার, জাতীয়তাবাদী, কমিউনিস্টপন্থী দলগুলোর সাথে ঐক্য গড়ে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু দিনশেষে ফল ভোগ করেছিল মুহাম্মাদ নাজিবুল্লাহ'র মত কমিউনিস্ট মুরতাদ শাসকরা। তাই মু'মিনরা ঐক্যবদ্ধ হবে ঈমান এবং তাওহীদের ভিত্তিতে। অন্য কোন ধারণা প্রসূত মাসলাহার ভিত্তিতে নয়। কারণ একজন মু'মিনের জন্য তাওহীদের মাসলাহাই সবচেয়ে বড় মাসলাহা। তাওহীদ পরিপন্থি এবং ঈমান বিধ্বংসী কাজের মাঝে কোন মাসলাহা থাকতে পারে না। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে আফগানিস্তান থেকে হটানোর ব্যাপারে সবাই একমত ছিল–এটা ঠিক, কিন্তু একটি বিষয় আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তা হল - আমরা কেন লড়াই করি? আমাদেরকে এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝা দরকার যে, আমরা কেন লড়াই করি? আমাদের লড়াই করার উদ্দেশ্য কী? আমরা লড়াই করি যেন দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয় এবং শিরক বাকি না থাকে। আমরা শিরক নির্মূল করা এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে লড়াই করি। আমরা শুধুমাত্র কোন দখলদার বাহিনীকে হটানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করি না। বরং আমরা যুদ্ধ করি আল্লাহর শারীয়াহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। কিন্তু দখলদার কুফফার বা মুরতাদ বাহিনীকে হটানো ব্যতীত

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই তাদের বিরুদ্ধেও আমরা লড়াই করি। ধরুন, আমাদের লড়াইয়ের ফলে দখলদার বাহিনী থেকে কোন ভূমি দখলমুক্ত হল কিন্তু দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হলো না। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কী? যেহেতু দেশ দখলদার মুক্ত হয়েছে তাই আমরা কি লড়াই বন্ধ করে দিব? না-কী করব? আমরা আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তার আদেশ অনুসারে লড়াই চালিয়ে যেতে বাধ্য। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দখলদার বাহিনী প্রতিবন্ধক হোক বা স্বদেশী মুরতাদ শাসক এবং এর সৈন্যরা–যে প্রতিবন্ধক হবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে। যে কেউ আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে তার বিরুদ্ধেই লড়াই চলবে। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনই শুধুমাত্র আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং আমাদের কাঙ্ক্ষিত মানযীল আরো উঁচুতে, তা হল - আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। যদি দখলদার বাহিনী চলে যায় কিন্তু শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা না হয়, তবে কি আমাদের লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হাসিল হবে? আল্লাহর কসম! কখনোই আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। এবার চলুন দখলদার রুশ বাহিনী চলে যাওয়ার পরবর্তী অবস্থা জেনে নেই। রুশরা চলে যাওয়ার পর আফগানিস্তানের ক্ষমতায় কে এসেছিলো তা আমরা পূর্বেই বলেছি। আফগানিস্তানের ক্ষমতায় এসেছিলো কমিউনিস্টপন্থি নাজিবুল্লাহ সরকার। সম্মানিত ভাইয়েরা আমার! এখানে আমাদের লড়াই করার উদ্দেশ্য কিন্তু অর্জিত হয়নি। সুতরাং ফলাফল শূন্য। এক তাগুতের স্থানে অন্য তাগুত প্রতিস্থাপন হয়েছে–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্।

বিপরীতে আরেকটি চিত্র দেখুন, আমেরিকা ২০০৩ সালে ইরাকে আক্রমণ করার পর বিভিন্ন মুজাহিদ দল আগ্রাসী কুফফারদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুজাহিদগণ যার যার জায়গা থেকে সামর্থানুযায়ী লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। ইরাকে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ এবং বিশুদ্ধ মানহাজের অধিকারী দূরদর্শী মুওয়াহহিদগণ ঐক্যবদ্ধ হন। তারা দূরদর্শিতা অর্জন করেছেন বিশুদ্ধ তাওহীদের জ্ঞানের আলোকে। তারা দূরদর্শিতা সম্পন্ন হয়েছেন সালফে সালেহীনগণের পথে চলার মাধ্যমে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাজলিসে শুরাল-মুজাহিদীন গঠন করেন। মুজাহিদগণের নেতৃবৃন্দ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাদের লক্ষ্য ছিল উঁচুতে। এব্যাপারটি আমরা শাইখ আবু

মুসআব আয-যারক্বাওয়ী ﷺ এর এক বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি। তিনি বলেন, "إننا نقاتل في العراق وعيوننا على بيت المقدس" “আমরা লড়াই করি ইরাকে কিন্তু আমাদের দৃষ্টি হচ্ছে বায়তুল মাক্বদিসে।” ইরাকে মুজাহিদগণের ঐক্যবদ্ধতা ৮০ এর দশকে আফগানিস্তানের যোদ্ধাদের ঐক্যের মত ছিল না। আফগানিস্তানকে দখলদার মুক্ত করার মত শুধুমাত্র ইরাক থেকে দখলদার আমেরিকাকে হটানোই উদ্দেশ্য ছিল না তাদের। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমত আমেরিকাকে ইরাকের ভূমিতে পরাজিত করা এবং একটি দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যমীনে আল্লাহর শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা। দ্বিতীয়ত তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আমেরিকাকে শুধু ইরাক থেকে হটানো নয় বরং স্পেন থেকে নিয়ে মুসলিমদের প্রতিটি দখলকৃত ভূমি থেকে দখলদার কুফফার বা তার মুরতাদ তাগুত এজেন্টদেরকে বের করে দেওয়া এবং সমগ্র পৃথিবী আল্লাহর বান্দাদের কর্তৃত্বে নিয়ে আসা যেন শিরক কুফর নির্মূল হয় এবং দ্বীন হয় পরিপূর্ণ আল্লাহর জন্য। মাজলিসে শুরা গঠন হওয়ার কিছুদিন পরই হিলফুল মুত্বইয়্যিবীন গঠিত হয়। আল্লাহর অনুগ্রহে এভাবেই আকাশচুম্বী লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মুজাহিদগণের পথ চলা সফলতার একেকটি ধাপ অতিক্রম করতে থাকে। অনিবার্য ফলস্বরুপ দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামীয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৬ সালে। এই দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মোচিত হয়। এই দাওলাহ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে ইমাম আনওয়ার আল-আওলাক্বী ﷺ বলেন, “অতি সম্প্রতি, ইরাকে বাগদাদে একটি দাওলাতুল ইসলামের ঘোষণা করা হয়েছে যা ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় যাবৎ শাসনকারী খিলাফাহ’র রাজধানী ছিল। বাগদাদ ছিল রাসুল ﷺ এর চাচা আব্বাস رضي الله عنه এর উত্তরসূরীদের শাসনাধীন। কারণ আমরা জানি যে, বাগদাদ আব্বাসীদের হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল– আল-খিলাফাহ আল-আব্বাসিয়্যাহ এবং তারা বাগদাদকে তাদের খিলাফাহ’র রাজধানী বানিয়েছিলেন। কয়েক শতাব্দী ধরে বাগদাদ-ই রাজধানী থেকে যায়। তাই ইরাকে দাওলাতুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং তা বাগদাদে প্রতিষ্ঠা হওয়া, যা ছিল আব্বাসী খিলাফাহ’র রাজধানী। উপরন্তু সেই দাওলাহ’র প্রধান হচ্ছেন হুসাইন বিন আলী বিন আবী তালিবেরর বংশধর যা অনেক গুরুত্ব রাখে। এই ঘটনা তত্ব থেকে বাস্তবের দিকে

অগ্রসর হওয়ার প্রায়োগিক চিন্তাধারাকে তুলে ধরে। ইসলামী শারীয়াহ এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারা এখন আর শুধু বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা এখন বাস্তব। এই ঘটনা প্রকাশ করে যে, এখন আর মুজাহিদগণ শুধু কাজ-ই করবে না এবং লড়াইয়ের পর লড়াই করবে না–এই জন্য যে, অন্যরা তাদের কাজের ফল ভোগ করবে। এখন তাদের নিয়ত শুধু দখলদার বাহিনীকে তাদের ভূমি থেকে বের করে দেয়া নয়, এই জন্য যে, অন্য এক মুনাফিক্ব এসে তাদের জায়গা দখল করবে। বরং এখন তারা দাওলাতুল ইসলামের প্রকল্প নিয়ে এগুচ্ছে, যা খিলাফাহ'র দিকে অগ্রসর হবে। ভাই ও বোনেরা! আমরা ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে যাচ্ছি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সেই হাদিসের চুরান্ত অংশেঃ ستكون خلافة على منهاج النبوة অচিরেই নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ আসবে।"

প্রিয় পাঠক! আপনি জানেন যে, ইরাকে আমেরিকার হামলার তিন বছর যেতে না যেতেই একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। আপনি কি ভেবেছেন–এর কারণ কী? আপনি কি ভেবেছেন তৎকালীন আফগানে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এবং ইরাকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈচিত্র্য ফলাফল নিয়ে? এখনো গল্পের অনেক বাকি! ইরাকে যুদ্ধের আট বছর পেরুতেই আমেরিকার মত সুপার পাওয়ার পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ইরাক ছাড়তে বাধ্য হয়। আট বছরের তীব্র যুদ্ধে আমেরিকা চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। আমেরিকা পরাজিত হয় এবং দূর্বল হয়ে যায়। কোন রকম চুক্তি ছাড়াই লাঞ্ছিত অবস্থায় ইরাক ছেড়ে চলে যায়–আলহামদুলিল্লাহ। আফগানিস্তানে ১০ বছর রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর তাগুত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলো ঠিকই কিন্তু তার স্থলাভিষিক্ত হলো স্থানীয় তাগুত নাজিবুল্লাহ সরকার। অন্যদিকে আমেরিকা ইরাকে হামলার তিন বছর শেষে ইরাকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো এবং হামলার মোট আট বছর পর দাওলাতুল ইসলামের কাছে আমেরিকা পরাজিত হয়ে ইরাক ছাড়ল। এ দু'টির মধ্যে কোনটি আসল সফলতা?[9] আমি শুধু পাঠকের বিবেকের কাছেই প্রশ্ন রেখে যেতে চাই!

[9] এখানে আফগানিস্তানে মুজাহিদগণের বরকতময় জিহাদকে ছোট করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হল মূল বাস্তবতা তুলে ধরা।

তালেবান জাতিসংঘ নামক কুফফারদের সংঘের সদস্য হতে চায়ঃ

আমরা বিগত সময়গুলোতে দেখেছি এবং এখনো দেখছি, তালেবান জাতিসংঘের সাথে সুসম্পর্ক করার ঘোষণা দিয়েছে, জাতিসংঘের প্রচারপত্র রক্ষা করার ঘোষণা দিয়েছে এবং তালেবান জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তালেবান সুহাইল শাহীনকে জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়েছে।

প্রিয় ভাই! জাতিসংঘের সাথে তালেবানের এই দহরম-মহরমের বিষয়টি তো আমরা তালেবানের বিভিন্ন নেতা আর তালেবানের অফিসিয়ালি ওয়েবসাইট থেকেই জানতে পেরেছি। তালেবান তাদের একাজগুলোকে ভুল তো মনে করেই না উপরন্তু তারা এগুলো গর্বের সাথে প্রকাশ করে।

জাতিসংঘ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠাই হয়েছে ইসলাম ও মুসলিমদের নিঃশেষ করার জন্য, অশ্লীলতা প্রচার করার জন্য, ইসলামী শারীয়াহ'কে বিলুপ্ত করার জন্য। আমরা জানি যে, এই শতাব্দীর মুজাহিদ আলেমগণ আরবের শাসকদেরকে তাকফীর করার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে জাতিসংঘে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। বিশেষত আল-কায়দার অনেক শাইখ সৌদি, কাতার, কুয়েত–এই সমস্ত দেশের শাসকদের যেসকল কুফরির কারণ বর্ণনা করেছেন এর একটি হচ্ছে জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্ত হওয়া। কারণ জাতিসংঘ হচ্ছে একটি কুফরি জোট। জাতিসংঘ হচ্ছে তাগুত। এই জাতিসংঘ মুসলিমদের মুরতাদ হওয়ার আহ্বান করে। এই জাতিসংঘ আল্লাহর শারীয়াহ বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন দ্বারা শাসন করার আহ্বান করে। এই তাগুতী সংস্থা অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার দিকে আহ্বান করে। জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী বলেন, "এটা এমন এক সংস্থা যা আল্লাহর শারীয়াহ'র প্রতি দায়বদ্ধ নয়, ধর্মহীনতা ও মুরতাদ হওয়ার আহ্বান জানায় এই সংস্থা, ইসলাম ও মুসলিমদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কে গালি দেওয়া এবং মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা করাই এই সংস্থার চরিত্র। ইসলামী শারীয়াহ'র প্রতি ভালবাসা পোষণকারী, রিদ্দাহ ও ধর্মহীনতায় নাখোশ, এসবে বারণকারী, আল্লাহর

দ্বীন ও নাবী ﷺ -এর প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং মুসলিম ভাইদেরকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা লালনকারী কোন মুসলিমের পক্ষে কিভাবে এই জাতিসংঘের সদস্য হওয়াটা মেনে নেওয়া সম্ভব? কিভাবে সম্ভব?”[10]

শাইখ সুলাইমান আল-উলওয়ান ﷿ বলেন, “অতঃপর শারয়ী কিছু হুদুদ এবং সুনির্দিষ্ট অংশ অপসারণের ব্যাপারে জাতিসংঘের চুক্তিগুলো মেনে নেয়া। উদাহরণস্বরূপ জিহাদকে অপরাধ সাব্যস্ত করা। প্রতিটি এমন দেশ যারা জাতিসংঘের চুক্তিসমূহ মেনে চলে, তাদের জিহাদ আত-ত্বলাব তথা আক্রমণাত্মক জিহাদকে অপরাধ সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়। আল্লাহর ফরজ বিধানসমূহের মধ্য থেকে একটি ফরজ বিধানকে অপরাধ সাব্যস্ত করা–কোন মুসলিম এব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে না যে, এটি একটি ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়।”

আমরা জানি যে, তালেবান ২০২১ সালের ১৫ ই আগষ্ট আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের দিন কয়েক পরে জাতিসংঘে যাওয়ার জন্য আবেদন করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে তালেবানের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে কথা বলার জন্য সুহাইল শাহীনকে প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে এখনই তালেবানকে গ্রহণ করেনি বিধায় তালেবান জাতিসংঘের অধিবেশনে যেতে পারছে না। কিন্তু যখন জাতিসংঘ এব্যাপারে সম্মতি দিবে তখন তালেবান জাতিসংঘে যাবে। যার জন্য তালেবান সুহাইল শাহীনকে জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে রেখেছে।

এখন কেউ বলতে পারে, মোল্লা ওমার ﵀ এর সময় তো তালেবান জাতিসংঘের স্বীকৃতি চেয়েছিল। আমরা বলি, প্রথমতঃ স্বীকৃতি চাওয়ার আলোচনা উঠা আর জাতিসংঘে যোগদান করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা এক বিষয় নয়। এরপরেও আমরা ইউসুফ আল-উআইরী ﵀ এর বক্তব্যটি এখানে নক্বল করছিঃ তিনি বলেছেন, “যখন আমি মুফতি নিজাম উদ্দীন শামজাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা শুনেছি যে, তালেবান জাতিসংঘে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেছে, (এটা

[10] নাসীহাতুল উম্মাতিল মুওয়াহহিদাহ বি-হাক্বীকতিল উমামিল মুত্তাহিদাহ

কি সত্য)? - তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এটা সত্য। আমি নিজে এবং কয়েকজন উলামা গিয়ে আমীরুল মু'মিনীনকে পরামর্শ দিলাম। তাই তিনি (আমীরুল মু'মিনীন) বললেন, আমি (ইসলামী ইমারাতের) স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই চাই না এবং আমরা শুধুমাত্র তাদের আইন থেকে সেই আইন প্রয়োগ করব যা শারীয়াহ'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আমরা তাকে বলেছিলাম, আজকের বাস্তবতায় এটা সম্ভব নয়- শুধুমাত্র জাতিসংঘে প্রবেশ করাই কুফর, কুফরি বিধান থেকে তারা যা বাধ্যতামূলক করে তার কারণে। তাই আমরা তাকে ছেড়ে দিলাম এবং সে সন্দেহ ও অনিশ্চিত রয়ে গেল। এবং এই বছর যখন আমরা তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, তখন আমরা দেখতে পেয়েছি যে, এই ধারণাটি তার মনের মধ্য থেকে মুছে গেছে।" সুতরাং শাইখ এখানে উল্লেখ করেছেন, কেবলমাত্র জাতিসংঘে প্রবেশ করাই একটি কুফরির কারণ। আর তৎকালীন আল-কায়দার শাইখগণ যখন এ বিষয়টি শুনেছেন তখন তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বিষয়টি যাচাই করেছেন। কিন্তু যখন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার স্বীকৃতির বিষয়টিও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেন তখন বাকিরা সকলেই স্বস্তি অনুভব করেন।

কারো দাবি হতে পারে যে, মোল্লা ওমার ﷬ তো জাতিসংঘের স্বীকৃতি চাওয়ার কথা বলেছিল। এক্ষেত্রে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে- মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার ﷬ যখন জাতিসংঘের স্বীকৃতি চাওয়ার কথা বলেছিলেন তখনই মুহাক্কীক্ব কিছু আলেম মোল্লা ওমার ﷬ এর সাথে সাক্ষাৎ করে জাতিসংঘে যোগদানের ভয়াবহতা সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তারা মোল্লা ওমার ﷬ কে বুঝাতে সক্ষম হন যে, জাতিসংঘে প্রবেশ করা কুফর। তখন তিনি এ থেকে বিরত থাকেন। এখানে একজন ব্যক্তি একটি কাজের কথা চিন্তা করেছে কিন্তু যখন এই কাজের ব্যাপারে শারয়ী হুকুম তাকে অবহিত করা হয়েছে তখন সে এই কাজ করার চিন্তাই বাদ দিয়েছে। ঠিক মোল্লা ওমার ﷬ এর ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছে। আর ঐ সময়টাতে ইসলামের ব্যাপারে জাতিসংঘের এতো নিকৃষ্ট কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অনেক মুসলিমই অনবহিত ছিল। কিন্তু নতুন করে পশ্চিমারা মুসলিমদের দেশগুলোতে আগ্রাসন চালানোর পর বিষয়টি সবার সামনেই স্পষ্ট হয়ে যায়। যাইহোক, কিন্তু

এবার তালেবান যখন জাতিসংঘে যাওয়ার আবেদন করল এবং একজন স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ করল তখনও আমরা দেখেছি তালেবানের অনুগত ডাক্তার যাওয়াহিরী জাতিসংঘে প্রবেশের কুফল সম্পর্কে সতর্ক করলেন। কিন্তু তার এ সতর্ক করাতে কোন লাভই হয়নি। জাতিসংঘে যাওয়ার ব্যাপারে তালেবান কোন নীতি-ই চেঞ্জ করেনি। বরং তালেবানের ঊর্ধ্বতন নেতাদের বক্তব্যে ও বিবৃতিতে জাতিসংঘ সম্মতি দিলে তালেবানের যোগদানের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হচ্ছে। এমনকি সেই স্থায়ী প্রতিনিধি দিন কয়েক আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছে, জাতিসংঘে তাদের স্থানে যাওয়ার জন্য তারা জোড় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এখানে আরো একটি বিষয় হচ্ছে তালেবান ক্ষমতায় যাওয়ার আগে জাতিসংঘের প্রচারপত্র রক্ষা করার এবং জাতিসংঘের সাথে সুসম্পর্ক রাখার ঘোষণা দিয়েছে। জাতিসংঘের সবকিছুই শারীয়াহ বিরোধী–বিষয়টি ডাক্তার যাওয়াহিরীও তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন। জাতিসংঘ যে একটি তাগুতী সংস্থা এতে তো কারো দ্বিমত নেই। তাহলে কিসের ভিত্তিতে তালেবান জাতিসংঘের সাথে সুসম্পর্ক রাখে? আপনি চিন্তা করুন– যারা সর্বত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এমন একটি কুফরি জোটের সাথে কিভাবে তালেবান সুসম্পর্ক বজায় রাখছে। এমনকি জাতিসংঘের সবচেয়ে নিকৃষ্ট একটি সংস্থা হচ্ছে ইউনেস্কো। এই ইউনেস্কো জাতিসংঘের সংস্কৃতি বিষয়ক একটি সংস্থা। অশ্লীলতা, যিনা-ব্যভিচার, নারী অধিকারের নামে মুসলিমা নারীদেরকে কুফরিতে লিপ্ত করাসহ আরো অনেক অপকর্মের প্রচারক হচ্ছে এই ইউনেস্কো। এই ইউনেস্কো আফগানিস্তানে এখনো কাজ করে যাচ্ছে। একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার رحمه الله এর তালেবান যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তো আফগানিস্তানে জাতিসংঘের এতো আনাগোনা ছিল না। কিন্তু এখন কেন আফগানে জাতিসংঘের অফিস বিদ্যমান, তাদের কার্যক্রম বিদ্যমান?! আমরা আরো দেখি তালেবান জাতিসংঘের নারী প্রতিনিধিসহ অনেকের সাথে দফায় দফায় বৈঠক করে যাচ্ছে। অথচ তাদের উপর আবশ্যক ছিল পরিপূর্ণভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী, আল্লাহ ও তার রাসুলকে গালিদাতা, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা প্রচারকারী এবং মুসলিমদেরকে রিদ্দায় নিক্ষেপকারী এই কুফরি তাগুতী জাতিসংঘের থেকে বারা তথা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করা। জাতিসংঘ একটি তাগুতী কুফরি সংস্থা এটা কি তালেবান জানে না?

কিছুদিন পূর্বেই তো তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাতিসংঘ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনো ইয়েমেন, সোমালিয়া, মালি, কঙ্গোতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আল্লাহ তো এই সমস্ত তাগুতকে অস্বীকার করতে বলেছেন, বলেছেন তাদের সাথে শত্রুতা করতে। জাতিসংঘের সাথে সুসম্পর্ক করা কি কাফিরদের সাথে ওয়ালা করার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তাগুতকে অস্বীকার না করার অন্তর্ভুক্ত নয়? অথচ তালেবান জাতিসংঘে যোগ দিতে চাচ্ছে এবং তাদের পক্ষ থেকে একজন স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়েছে—যা সুস্পষ্ট কুফর।

শাইখ আবু হাফস আশ-শামী ﷾ বলেন, “আমরা জাতিসংঘ সংস্থার কুফরির দিকগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। তাই আমরা বলি, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে এই সংস্থাকে সমর্থন করবে সে কাফির, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে জাতিসংঘের চুক্তিপত্রের দিকে আহ্বান করে অথবা একে স্বীকৃতি দেয় বা তা মেনে চলে অথবা একে শ্রদ্ধা করার ঘোষণা দেয় সে একজন কাফির। এই মাস’আলাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস’আলা। প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে জাতিসংঘের চুক্তিপত্র শ্রদ্ধা করার ঘোষণা দেয় সে একজন কাফির। এটা ঐ ব্যক্তির মত যে কুফরকে শ্রদ্ধা করার এবং স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দেয়।”[11]

আন্তর্জাতিক আইনকে শ্রদ্ধা করে তালেবানঃ

তালেবান আন্তর্জাতিক আইনকে শ্রদ্ধা করে। এটা তারা হরহামেশাই অকপটে বলে বেড়ায়। তালেবান কাতারে তাদের রাজনৈতিক অফিস খোলার পরে একটি সংবাদ সম্মেলন করে। সেই সম্মেলনে তালেবানের রাজনৈতিক অফিসের মুখপাত্র ড. নঈম বিবৃতি প্রদান করে। বিবৃতি প্রদানকালে ড. নঈম বলে, তালেবান আন্তর্জাতিক আইনকে শ্রদ্ধা করে। কিছু দিন পূর্বে তালেবানের মুখপাত্র জবিহুল্লাহ মুজাহিদ ফ্রান্স টুয়েন্টি ফোরকে দেয়া এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক তৈরির কথা

[11] দুরূসুন ফীত-তাওহীদ

প্রসঙ্গে বলেছে, "ফ্রান্সের সাথে আমরা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করতে চাই।" এছাড়াও তালেবানের নেতাদের বিভিন্ন বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারে আন্তর্জাতিক আইন স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে।

গেল কিছু দিন পূর্বে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের নৃশংস হামলার প্রেক্ষিতে তালেবানের প্রধান বিচারপতি আব্দুল হাকিম হাক্কানী বিবৃতি দিয়েছে। সেই বিবৃতিতে তালেবানের প্রধান বিচারপতি বলেছে, "আমরা আন্তর্জাতিক আদালত ও ট্রাইব্যুনালকে আহ্বান জানাই, **তারা যেন দখলদার ইহুদিবাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে** গুরুত্বের সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়। এই দখলদার বাহিনী সময়ের সাথে সাথে নিজেরাই নিজেদের বর্বরতাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে।"[12] ইহুদীরা ফিলিস্তিনে মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত নৃশংস নির্যাতন চালাচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্য কি আন্তর্জাতিক আদলতের দ্বারস্থ হতে হবে?

আমরা সকলেই জানি যে, আন্তর্জাতিক আইন হচ্ছে কুফরি আইন। এই আইনের প্রণেতারা হচ্ছে কাফির। কিভাবে একজন ব্যক্তি কুফরি আইনকে শ্রদ্ধা করার কথা বলতে পারে! হারবী কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তাও আবার তাদের আইন অনুসারে! আল্লাহর নিকট এর থেকে আশ্রয় চাই। তালেবানের পক্ষ থেকে এই আইনকে শ্রদ্ধা করার ঘোষণা কি এই আইনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা নয়? অথচ আমরা জানি যে, আহলুল ইলমগণ বর্ণনা করেছেন, "কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াও কুফর।" তাহলে তালেবান আজ কোন পথে হাটছে! কিভাবে তালেবানের প্রধান বিচারপতি আন্তর্জাতিক তাগুতী আদলতকে বিচার করার জন্য আহ্বান জানাতে পারে! শাইখ আবু হাফস আশ-শামী حفظه الله বলেন, "এমনিভাবে প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে আন্তর্জাতিক আইনকে অথবা এর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে বা এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য আহ্বান করবে সে কাফির। আমরা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যে, আন্তর্জাতিক আইন হচ্ছে এমন পরিভাষা যার মাধ্যমে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত এবং নিরাপত্তা পরিষদের আইনসমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়। তাই প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে

[12] আল-ফিরদাউস নিউজ, তারিখ ০৬/১১/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

আন্তর্জাতিক আইনকে এবং এর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে অথবা এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান করে সে একজন কাফির।"[13]

আবার কেউ কেউ বলে যে, "মাসলাহার কারণে তালেবান এই ধরনের বিবৃতি দিচ্ছে এতে কোন সমস্যা নেই।" শাইখ উসামা رحمه الله বলেন, "রাষ্ট্রের মাসলাহা থেকে শারীয়াহ'র মাসলাহা অনেক বড়।"[14] আমাদের বক্তব্য হবে সালাফগণের বক্তব্যের আলোকে। আমরা জানি যে, মাসলাহার কারণে কুফরি কথা বলা বৈধ নয়। যেমন ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله বলেন, "উম্মাহ'র মাঝে এব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই যে, কোন মাসলাহা বা স্বার্থের কারণে কুফরি কথা বলার অনুমিত দেয়া জায়েয নেই। তবে যাকে বাধ্য করা হয় সে ব্যতীত যখন তার অন্তর ঈমানের প্রতি প্রশান্ত থাকে।"[15] তাহলে কি ড. নঈম আর জবিহুল্লাহ মুজাহিদসহ তালেবানের নেতারা আন্তর্জাতিক আইনকে শ্রদ্ধা করা এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে নেয়ার কথা বলতে বাধ্য হয়েছে? ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, "শিরক করা, ইলমহীন আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলা, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা এবং জুলুম–এগুলোর মধ্যে কোন মাসলাহা নেই।"[16]

সুতরাং যারা তালেবানের এই ধরনের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মাসলাহার অজুহাত দেয় তাদের যুক্তি সালাফগণের বক্তব্য অনুসারে প্রত্যাখ্যাত। বাস্তবিকপক্ষে তালেবানও তাদের এই ধরনের কাজের ব্যাপারে মাসলাহার অজুহাত দেয় না।

[13] দুরূসুন ফীত-তাওহীদ

[14] খুতওয়াতুন আমালিয়্যাহ লি-তাহরীরি ফিলিস্তিন

[15] ই'লামুল মুআক্কিয়ীনঃ ৩/১৭৮

[16] মাজমুউল ফাতাওয়াঃ ১৪/৪৭৬

আমাদের আম্মাজান আয়িশা ﵂ কে গালিদাতা ও যিনার অপবাদ আরোপকারীদের প্রতিরক্ষাকারী তালেবানঃ

আমরা জানি যে, তালেবান মুশরিক রাফিদীদেরকে তাদের দলভুক্ত করেছে, তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। এমনকি তালেবান রাফিদীদেরকে আশুরার নামে শিরকী উৎসব পালন করার অনুমতি দিচ্ছে এবং সেই উৎসব সফলভাবে পালন করার জন্য নিরাপত্তা দিচ্ছে। আর রাফিদীদের সেই আশুরা উৎসবে কী পালিত হয়? তারা সেই উৎসবে সাহাবীদেরকে গালি দেয়, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ﵂ কে ব্যভিচারিণী আখ্যায়িত করে তার প্রতিকৃতি বানিয়ে রজম করে, আলী এবং হুসাইন ﵄ -তাদের ইবাদাত করাসহ প্রভৃতি শিরকী বিষয় পালন করে। তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া এক মুরতাদ সম্প্রদায়। রাফিদীদেরকে কাফির সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আলেমগণের ইজমা রয়েছে। কিন্তু তালেবান রাফিদীদের এই সমস্ত শিরকী কর্মকাণ্ড অপসারণ বা উৎখাত তো করেই না উল্টো যারা সাহাবীদের গালিদাতা রাফিদীদের শিরকী কর্মকাণ্ড উৎখাত করার চেষ্টা করে তালেবান তাদেরকে হত্যা করে, বন্দি করে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এরচেয়ে গুরুতর বিষয় হচ্ছে তালেবান এই রাফিদীদের আক্বীদাসমূহকে সম্মান করে—ওয়াল-ইয়াযু বিল্লাহ। তালেবান ঘোষণা দিয়েছে যে, রাফিদীরা তাদের আক্বীদাহ চর্চা করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তালেবানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী শের আব্বাস স্টানিকজাই মিডিয়াকে দেয়া এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেছে, "আফগানিস্তানে জাফরী ফিক্বহের আমাদের শিয়া ভাইদের প্রতি, আমরা তাদের আক্বীদাহ এবং উসুলকে ইহতিরাম তথা সম্মান করি। আমরা তাদের উপর কখনো জুলুম করিনি এবং পূর্বেও তাদের সাথে আমাদের কোন সমস্যা ছিল না। আর এখনোও তাদের সাথে আমাদের কোন সমস্যা নেই। আমরা তাদেরকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আর তারা তাদের আক্বীদাহ চর্চার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ধন্যবাদ।"

জাফরী শীয়ারা বারো ইমামে বিশ্বাসী রাফিদীদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে - "আমরা তাদের আক্বীদাহ এবং উসুলকে সম্মান করি"—এই অংশটুকু। তালেবান রাফিদীদের আক্বীদাহ এবং উসুলকে সম্মান করে যা দ্বীন

ভঙ্গকারী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

এখন রাফিদীদের কিছু আক্বীদাহ সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন। জাফরী শীয়ারা বারো ইমামে বিশ্বাসী রাফিদী। আর বারো ইমামে বিশ্বাসী রাফিদীদের অসংখ্য শিরকী আক্বীদাহ রয়েছে। যেমন তারা মনে করে আমাদের মাঝে বিদ্যমান পবিত্র কুরআন হচ্ছে বিকৃত। তারা মনে করে বিপদাপদে আলী বিন আবী তালিব এবং হুসাইন رضي الله عنهما তাদেরকে সাহায্য করে। রাফিদীরা মনে করে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা رضي الله عنها হচ্ছে ব্যভিচারিণী–নাউজুবিল্লাহ। রাফিদীরা অধিকাংশ সাহাবীদেরকে তাকফীর করে। তারা সর্বদাই আবু বকর এবং ওমার رضي الله عنهما কে লা'নত করে। এছাড়াও রাফিদীদের আরো অনেক নিকৃষ্ট শিরকী আক্বীদাহ রয়েছে। কিভাবে তালেবান রাফিদীদের এই সমস্ত শিরকী আক্বীদাহসমূহকে ইহতিরাম করতে পারে? আর কিভাবেই বা যারা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা رضي الله عنها কে গালি দেয় তাদেরকে তালেবান ভাই বলে সম্বোধন করতে পারে? যারা সাহাবীদেরকে গালি দেয় তালেবান কিভাবে তাদের জন্য মুসলিম মুওয়াহহিদদেরকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে? তালেবানের গায়রত কি এতোটাই নিচে নেমে গেছে? নাকি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা رضي الله عنها এবং সাহাবীদেরকে গালি দিলে তালেবানের গায়রতে লাগে না? গেল আশুরায় রাফিদীদের শিরকী অনুষ্ঠানে তালেবান ঘোষণা দিয়েছে, রাফিদীদের সাথে তাদের পার্থক্য শাখাগত মাজহাবী পার্থক্য। সুবহানাল্লাহ! যারা আলী رضي الله عنه কে ইলাহ সাব্যস্ত করে তাদের সাথে কি ইসলামের শাখাগত পার্থক্য? যারা মনে করে কুরআন বিকৃত তাদের সাথে কি মুসলিমদের দ্বীনের পার্থক্য শাখাগত? আল্লাহর কসম! কখনোই না। ইসলামের সাথে রাফিদীদের দ্বীনের পার্থক্য শাখাগত নয় পার্থক্য হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য, পার্থক্য হচ্ছে ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য। তাহলে কিভাবে তালেবান তাদের শিরকী কুফরি আক্বীদাহ ও উসুলকে সম্মান করতে পারে! কিভাবে তালেবান এই সকল শিরকী আক্বীদাহ চর্চার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিতে পারে? আর কিভাবেই বা তালেবান রাফিদীদের শিরকী উৎসবগুলোকে বন্ধ না করে সেগুলোকে পালন করার জন্য নিরাপত্তা দিতে পারে? বরং যারা এই সমস্ত শিরকী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে চায়, যারা এই মুশরিক রাফিদীদের উৎখাত করতে চায় তালেবান তাদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে!

শাইখ ফারিস আলু শুআইল আয-যাহরানী রহিমাহুল্লাহ সৌদি শাসকদের তাকফীর করার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, "তারা কাফির কারণ তারা শিরকে আকবার তথা বড় শিরকের অনুমোদন দেয়, এটি পরিবর্তন করার চেষ্টাও করে না এবং অন্য কাউকে এটি পরিবর্তনের সুযোগও দেয় না–এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল যা মাসজিদে নববীতে ঘটেছে অপবিত্র রাফিদীদের কার্যক্রম।" অর্থাৎ শাইখ যাহরানী রহিমাহুল্লাহ মাসজিদে নববীতে রাফিদীদের কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়ার কারণে সৌদি শাসকদেরকে তাকফীর করার একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তালেবান কি কেবলমাত্র রাফিদীদেরকে তাদের কার্যক্রম করার অনুমতি দিচ্ছে? না, বরং তালেবান রাফিদীদের শিরকী উৎসবগুলোতে সশস্ত্র পাহারা দিচ্ছে। এরচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে তালেবান যারা রাফিদীদের ভাই বলে সম্বোধন করে এবং মনে করে ইসলামের সাথে রাফিদীদের দ্বীনের পার্থক্য শাখাগত ফিক্বহী মাজহাবী পার্থক্য। এরচেয়েও আরো ভয়াবহ হচ্ছে রাফিদীদের শিরকী কুফরি আক্বীদাহ ও মূলনীতিসমূহকে তালেবানের পক্ষ থেকে সম্মান করার ঘোষণা দেওয়া। তালেবানের এ ঘোষণা দেওয়া কি সুস্পষ্ট কুফর নয়?

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ বলেন, "কোন মানুষ যখন মুশরিকদের জন্য তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করবে–তাদের থেকে ভয়ের আশঙ্কা করে অথবা সৌজন্যমূলক আচরণ করে অথবা তাদের অনিষ্টতা প্রতিরোধ করার জন্য চাটুকারিতা করে তাহলে নিশ্চয়ই সে তাদের মত কাফির হয়ে যাবে। যদিও সে তাদের দ্বীনকে অপছন্দ করে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের ভালবাসে।"[17] তালেবান কি রাফিদীদের ভয়ে তাদের শিরকী আক্বীদাহ'কে সম্মান করার ঘোষণা দিয়েছে? রাফিদীদের আক্বীদাহ এবং উসুল যে শিরকী আক্বীদাহ ও উসুল এটা কি কোন মুসলিম অস্বীকার করতে পারবে?

এখন কেউ বলতে পারে যে, তালেবানের কয়েকজন নেতার বক্তব্য কি

[17] আদ-দালাঈল ফী হুকমি মুওয়ালাতি আহলিশ শিরক

তালেবানের বক্তব্য হিসেবে ধরা হবে? হ্যাঁ, তালেবানের কয়েকজন নেতার বক্তব্য তালেবানের বক্তব্য হিসেবে ধরা হবে; কারণ দল বা রাষ্ট্র যখন কোন বিবৃতি প্রকাশ করে তখন সেই দল বা রাষ্ট্র তার কোন একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। আর শের আব্বাস স্টানিকজাই একজন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সে এই বক্তব্য তালেবানের মন্ত্রীপরিষদের ব্যক্তিদের সামনে দিয়েছে। সুতরাং তার বক্তব্য তালেবানের বক্তব্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে। আর তালেবান রাফিদীদের সম্পর্কে এই ধরনের বক্তব্য বিগত কয়েকবছর আগ থেকেই দিয়ে আসছে। এছাড়াও তালেবানের কর্মকাণ্ডও শের আব্বাসের কথার প্রতিনিধিত্ব করে।

সাহাবীদের তাকফীরকারী রাফিদী মুশরিকদের বন্ধু তালেবানঃ

আমরা জানি যে, রাফিদীরা হচ্ছে মুরতাদ মুশরিক সম্প্রদায়। এব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই। রাফিদীরা বারো ইমামে বিশ্বাসী। তাই তাদেরকে ইমামিয়্যাহও বলা হয়। তাদেরকে তাকফীরের ব্যাপারে সামআনী رحمه الله ইজমা উল্লেখ করেছেন। তিনি رحمه الله 'আল-আনসাব' গ্রন্থে বলেন, "ইমামিয়্যাদেরকে তাকফীর করার ব্যাপারে উম্মাহ একমত হয়েছে। কেননা 'সাহাবীগণ পথভ্রষ্ট হয়েছেন' তারা এই আক্বীদাহ পোষণ করে, তারা সাহাবীগণের ইজমাকে অস্বীকার করে এবং তারা সাহাবীগণকে এমন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে যার যোগ্য তারা নয়।"

মুওয়াহহিদ মুজাহিদগণ যখন খোরাসানে মুশরিক রাফিদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন তখন তালেবান এই মুশরিকদের পক্ষ নিয়ে মুওয়াহহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। উজবেক মুজাহিদ গ্রুপ দাওলাতুল ইসলামকে বাইআত দেওয়ার পূর্বে আফগানিস্তান থেকে কিছু মুশরিক রাফিদীদের বন্দি করে নিয়ে যায়। মুজাহিদদের উদ্দেশ্য ছিল এই রাফিদীদের বিনিময়ে আফগান সরকারের কাছ থেকে কিছু মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করা। আফগান সরকার প্রায় ৯ মাস যাবৎ অভিযান চালিয়ে মুজাহিদদের কাছ থেকে সেই বন্দিদের মুক্ত করতে পারছিল না। তখন তালেবান নিজ উদ্যোগে রাফিদীদের সাথে মিলে উজবেক মুজাহিদদের আক্রমণ করে

তাদেরকে এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানদের হত্যা করে সেই মুশরিক রাফিদীদের মুক্ত করে। তালেবান এই কাজ করার পর নিজেদের ওয়েবসাইটে গর্বভরে প্রকাশ করে যে, আফগান সরকার যা ৯ মাস ধরে করতে পারেনি তালেবান তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন করেছে। আমরা জানি যে, রাফিদীরা হচ্ছে মুরতাদ মুশরিক সম্প্রদায়। কেউ কেউ মনে করে তালেবান হানাফী মাজহাবের অনুসরণ করে বিধায় তারা রাফিদীদের সাথে এমন আচরণ করে। আমরা পূর্বে রাফিদীদেরকে তাকফীরের ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছি যা ইমাম সামআনী বলেছেন। আর হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ মহান দুই ইমাম আবু হানীফা এবং আবু ইউসুফ رحمهما الله –তাদের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করছি। যখন ইমাম আবু হানীফার নিকট শীয়াদের কথা আলোচনা করা হত তখন তিনি সর্বদাই এ উক্তি পুনরাবৃত্তি করতেন, “যে ব্যক্তি এদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে সে তাদের মতই একজন কাফির।”[18] কাযী আবু ইউসুফ رحمه الله বলেন, “আমি কোন জাহমিয়্যাহ’র পিছনে, কোন রাফিদীর পিছনে এবং কোন কাদেরিয়্যাহ’র পিছনে সালাত পড়ি না।”[19]

সুতরাং আহলুস সুন্নাহ’র সকল আলেমগণ একমত যে, রাফিদীরা কাফির মুশরিক। তাহলে তালেবান কিভাবে এই মুশরিকদের পক্ষে গিয়ে মুসলিমদের হত্যা করে! এটা কি মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা নয়? যারা উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা رضي الله عنها কে গালি দেয় এবং জাহান্নামী আখ্যায়িত করে তালেবান তাদের পক্ষে গিয়ে কিভাবে মুসলিমদের হত্যা করে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে রাফিদীদের সাহায্য করে এবং এই রাফিদীদের পক্ষে মুসলিম মুওয়াহহিদদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে?! তালেবানের এ কাজ কি মুওয়াহহিদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিক রাফিদীদের সাহায্য করার অন্তর্ভুক্ত নয়? আমরা আল্লাহর নিকট এ কুফর থেকে আশ্রয় চাই।

খুরাসানে দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ যখন আফগানিস্তান-ইরান

---

18 আল-কিফায়াহ

19 লালাকাঈ ‘উসুলু ই’তিক্বাদী আহলিস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ’তে বর্ণনা করেছেন।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন তখন ইরান তালেবানের সাথে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে একটি চুক্তি করে। সেই চুক্তির সারমর্ম ছিল এরূপঃ তালেবান দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের থেকে আফগানিস্তানের সাথে ইরানের লাগোয়া সীমান্ত নিরাপদ রাখবে আর ইরান এক্ষেত্রে তালেবানকে যুদ্ধাস্ত্র দিবে। এটা কি কল্পনা করা যায় যে, ইরানের মত এক নিকৃষ্টতম মুরতাদ রাষ্ট্রকে নিরাপদ রাখার জন্য তালেবান মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আর এর বিনিময় হিসেবে তালেবান কিছু যুদ্ধাস্ত্র পাবে? ইরানের মাজুসীরা যে মুশরিক এব্যাপারে কোন মুসলিম কি সন্দিহান থাকতে পারে? আল্লাহর কসম! তালেবান এভাবেই রিদ্দায় পতিত হয়েছে। তারা মুশরিকদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের হত্যা করছে।

তালেবান ও ইরানঃ

আহলুস সুন্নাহ'র সাথে ইরানের চির শত্রুতা কোন গোপন ইস্যু নয়। বরং ইরান প্রকাশ্যেই আহলুস সুন্নাহ'র প্রতি তাদের শত্রুতা জাহির করে। ইরানে আহলুস সুন্নাহ'র প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এর বাস্তবতা বুঝা যায়। হাজার হাজার মুসলিমদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছে এবং শতসহস্র মুসলিমকে হত্যা করেছে। আর ইরাক ও সিরিয়ায় ইরানের মদদপুষ্ট ও আজ্ঞাবহ মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলো যে আহলুস সুন্নাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের হত্যা করছে, নির্যাতন করছে এবং মুসলিমা মা-বোনদের ধর্ষণ করছে–এগুলো একজন বিচক্ষণ মুসলিমের অজানা নয়। এই সমস্ত অপকর্ম ইরান এখনো চলমান রেখেছে। এতদসত্ত্বেও তালেবান ইরানের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করেছে। গেল বছর তালেবান ইরানের সাথে মিলে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে একত্রে কাজ করবে এই মর্মে একটি নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এমনকি তালেবান ক্ষমতায় আসার আগ থেকেই ইরানের সাথে সুসম্পর্ক গড়ার কথা বলে আসছিল। অথচ নব্বই দশকের তালেবান ইরানের ব্যাপারে এমন অবস্থানে ছিল না। চিন্তা করা যায়, কাসেম সুলাইমানীর মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তালেবানের নেতারা যোগদান করে!

আফগানিস্তানে অনুষ্ঠিত কাসেম সুলাইমানীর মৃত্যুবার্ষিকীতে তালেবানের নেতারা সেখানে গিয়ে কাসেম সুলাইমানীকে শহীদ হিসেবে আখ্যায়িত করে! অথচ ইরান, ইরাক ও সিরিয়ায় আহলুস সুন্নাহ'কে হত্যা, গুম ও নির্যাতন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মূল ভূমিকায় ছিল এই কাসেম সুলাইমানী। তালেবানের পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের এই ঘোড় শত্রুকে কিভাবে শহীদ বলা হয়? তালেবান ক্ষমতায় আসার পর আফগানিস্তানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইরানী বিপ্লবের বার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়! আর সেই অনুষ্ঠানে তালেবানের মন্ত্রীপরিষদের নেতারা ইরানী বিপ্লবকে ইসলামী বিপ্লব আখ্যায়িত করে! বাণিজ্যিক, নিরাপত্তাসহ প্রতিটি বিষয়ে তালেবান ইরানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু অপরদিকে আহলুস সুন্নাহ'র মুসলিমদের বুকে প্রতিনিয়ত ইরান যে ছুরিকাঘাত করছে তালেবান সেটাকে অগ্রাহ্য করে চলছে। তালেবানের কাছে এখন সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় টিকে থেকে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নতি করা। এক্ষেত্রে কার সাথে মিত্রতা করবে আর কার সাথে শত্রুতা করবে সেটা তাদের নিকট কোন বিষয়-ই না। গতবছরের শেষের দিকে তালেবানের উপপ্রধানমন্ত্রী আব্দুল গণি বারদার ইরান সফর করে ইরানের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে জোড় দিয়েছে। সেসময় ইরানের সাথে চাবাহার বন্দর ব্যবহার, বাণিজ্য, শিল্প, ট্রানজিট, কৃষি, খনি, তেল-গ্যাস, সীমান্ত, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, রেলপথ, যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি, বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবস্থাপনা খাতসহ আরো বিভিন্ন খাতে প্রায় ৬৮ টি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে তালেবান। আর তালেবানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আমীর খান মুত্তাকীর ভাষ্যমতে ইরানের সাথে তাদের সম্পর্ক উন্নয়ন করা খুবই জরুরী। কিছুদিন পূর্বে আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশে ইরানের অর্থায়নে তালেবান একটি হসপিটাল তৈরি করেছে। তালেবান সেই হসপিটালের নাম দিয়েছে '১২০ শয্যা বিশিষ্ট ইমাম খমিনী (রাদিঃ) হসপিটাল'। আহ তালেবান আহ! কতটা অধঃপতন আর কতটা অবনমন!

সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে তালেবান মুসলিমদের অন্যতম শত্রু ইরানের সাথে একত্রে কাজ

করবে—এব্যাপারে দুই পক্ষের মাঝে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তালেবান এভাবেই মুসলিমদের নির্যাতনকারীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ইরানকে আপন করে নিয়েছে। তালেবান আপন করে নিয়েছে সিরিয়ায় মুসলিমদের উপর বর্বর নির্যাতনকারী বাশার আল-আসাদ ও তার নুসাইরী বাহিনীকে সাহায্যকারী ইরানকে। অসহায় মুসলিমদের উপর নির্যাতন, হত্যা ও মা-বোনদের ধর্ষণকারী ইরাকের রাফিদীদের এবং ইয়েমেনের হুথিদের সহায়তাকারী ইরানকে শত্রুর বিপরীতে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে তালেবান।

আমেরিকা তালেবান কথিত চুক্তি প্রসঙ্গঃ

কথিত চুক্তির বাস্তবতা–যা প্রকৃতপক্ষে কুফফার জাতি–গোষ্ঠির নিকট বশ্যতা স্বীকারের নামান্তরঃ

আমরা সকলেই জানি যে, তালেবান আমেরিকার সাথে কিছু শর্তের আলোকে চুক্তি করে আফগানিস্তানের ক্ষমতা পেয়েছে। সেই শর্তগুলোর অন্যতম একটি শর্ত ছিল, আফগানিস্তানের ভূমি ব্যবহার করে আমেরিকার ও তার মিত্রদের ক্ষতি করবে –এমন কাউকে তালেবান এব্যাপারে অনুমতি দিবে না এবং তালেবান আফগানিস্তান থেকে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের নিশ্চিহ্ন করবে। এই শর্তের উপর তালেবান কাজ করবে আর আমেরিকা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবে। বিষয়টি কি এমন নয় যে, যেই আফগানের ভূমি ব্যবহার করে শাইখ উসামা আমেরিকাকে আঘাত করেছিলেন আজ তালেবান সেই আফগানের ভূমি ব্যবহার করে কাউকে আমেরিকার উপর আঘাত হানতে দিবে না? পাশাপাশি যারা শাইখ উসামার মত আফগানের ভূমি ব্যবহার করে ইসলামের অন্যতম শত্রু আমেরিকা ও তার মিত্রদের ক্ষতি করবে তালেবান তাদেরকেই দমন করবে। আমরা জানি যে, আল-কায়দা শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله এর মৃত্যুর কয়েকবছর পরই খোরাসান শাখা বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে। সুতরাং খোরাসানে আল-কায়দার নামে কোন কাজ হবে না। তালেবান সেই চুক্তিতে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, তারা আল-কায়দাকে আফগানের ভূমি ব্যবহার করতে দিবে না। এখন বাকি থেকে যায় দাওলাতুল ইসলাম। তালেবান এটাও স্পষ্ট করেছে যে, তারা দাওলাতুল ইসলামকেও আফগান ভূমি ব্যবহার করতে দিবে না–এটা কখন করেছে যখন তালেবানের হাতে পুরো আফগানের ভূমির কর্তৃত্ব নেই। তালেবান দাওলাতুল ইসলামের ব্যাপারে বাড়তি আরো একটি কয়েদ যুক্ত করেছে– তা হল, তালেবান আফগানিস্তান থেকে দাওলাতুল ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করবে। একটু লক্ষ্য করুন! কাদের সাথে এই চুক্তি করেছে? তালেবান এই চুক্তি করেছে হারবী কাফিরদের সাথে–যারা আজ অব্দি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করছে, তাদের কারাগারগুলোতে মুসলিমদেরকে বন্দি করছে, ফিলিস্তিনের মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সমর্থনসহ সবরকমের সহায়তা দিচ্ছে এবং মুসলিমদের দেশগুলোতে তাগুত শাসকদের শেল্টার দিচ্ছে। চুক্তির অন্যতম শর্ত কী ছিল? চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, যেসকল মুসলিমরা আল্লাহর যমীনে পরিপূর্ণ শারীয়াহ বাস্তবায়ন করতে চায় এবং পূর্বে উল্লেখিত সিফাতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হারবী কাফির আমেরিকার ক্ষতি করতে চায় তালেবান তাদেরকে দমন করবে। তালেবান সেই শর্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

কাফিরদের ছেড়ে দেয় এবং মুসলিমদের হত্যা করেঃ

তালেবান কাফিরদের ছেড়ে দেয় এবং মুসলিমদের হত্যা করে। আমরা দেখেছি, তালেবান যখন কাবুলের ক্ষমতা দখলে নিয়েছে তখন তালেবান কাবুলের কারাগার থেকে সকল বন্দিদের ছেড়ে দিয়েছিলো কেবলমাত্র দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের ব্যতীত। তালেবান যেদিন ক্ষমতা দখল করেছে এরপরের দিন দাওলাতুল ইসলামের একজন দায়িত্বশীলকে সবার সামনে হত্যা করেছে। সেই দায়িত্বশীলকে তো তালেবান বন্দি করেনি! তাহলে কী কারণে তালেবান তাকে হত্যা করেছে? কারণ তিনি ছিলেন দাওলাতুল ইসলামের একজন সৈনিক। আফসোস! তালেবানের কাছে রিদ্দায় পতিত আফগান সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং আমেরিকার সহযোগীরা ক্ষমা পেয়ে যায় কিন্তু দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকরা তালেবানের কাছে ক্ষমা পায়নি। হামিদ কারযায়ীর মত তাগুত, ইসলাম বিদ্বেষী ও শারীয়াহ বিরোধী আইন প্রণেতা নিরাপত্তা ও ক্ষমা পেয়ে যায় কিন্তু দাওলাতুল ইসলামের একজন সৈনিকও ক্ষমা পায় না! এর মূল কারণ হচ্ছে তালেবান দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের ছেড়ে দিলে আমেরিকা নাখোশ হবে। আমেরিকার সাথে তালেবানের চুক্তির অন্যতম শর্তই ছিল তালেবান আফগানিস্তানে দাওলাতুল ইসলামকে দমন করবে। আমরা আমেরিকার সাথে তালেবানের চুক্তির এই শর্তের বিষয়টি কোথা থেকে জানতে পেরেছি? আমেরিকার মিডিয়া থেকে? কখনোই না। আমরা এগুলো

তালেবানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা শের আব্বাস স্টানিকজাই, ড. নঈম, আব্দুস সালাম যাইফী, সুহাইল শাহীন, জবিহুল্লাহ মুজাহিদ, আমীর খান মুত্তাকী–এদের মুখ থেকেই জানতে পেরেছি। সুতরাং তালেবানের এ কাজ কি মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকার সাথে সুস্পষ্ট ওয়ালা নয়? শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله আল-জাজিরা চ্যানেলকে দেয়া এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "এমনকি কথার মাধ্যমে যে তাদের (ইহুদী-খ্রিষ্টানদের) সাহায্য করবে সে রিদ্দায় পতিত হবে যা রিদ্দায়ে জামিহার অন্তর্ভুক্ত–লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। এ কাজ কবিরাহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা হল আল্লাহ سبحانه وتعالى এর বিধান যার সুস্পষ্ট বর্ণনা আল্লাহ তা'আলার কিতাবে রয়েছে। আর এটা স্পষ্ট বিধানের একটি। প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনি আমর বলেন বা যায়েদ বলেন তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আপনি হক্ব চিনতে পারলে হক্বপন্থিদের চিনতে পারবেন। ব্যক্তি দ্বারা হক্বকে চিনবেন না। এটা হল আল্লাহ سبحانه وتعالى এর কিতাব যা আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত। যদি এর কোন বিষয়কে পরিবর্তন করার জন্য পুরো দুনিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলেও তা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না এবং আমাদের প্রত্যয়ের কোন অংশই পরিবর্তন হবে না। হয় তা হক্ব হবে অথবা বাতিল হবে। হয় ইসলাম হবে নতুবা কুফর হবে।"

শাইখ উসামা رحمه الله বলেছেন, একটি কথার মাধ্যমেও যদি কেউ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করে তাহলে সেটা রিদ্দায়ে জামিহা হবে। তালেবান কিভাবে "মুসলিমদের হত্যা করবে" এই শর্ত রেখে আমেরিকার সাথে চুক্তি করতে পারে? কিভাবেই বা তালেবান মুসলিমদের বিরুদ্ধে রাফিদীদের সাহায্য করছে? সকল আহলুস সুন্নাহ'র মতে তো বারো ইমামে বিশ্বাসী রাফিদীরা কাফির মুশরিক। আর কিভাবেই বা তালেবান মাজুসী ইরানের সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে মুসলিমদের হত্যা করে? আল্লাহর নিকট আমরা এর থেকে আশ্রয় চাই।

হারবী কাফির প্রসঙ্গে উস্তাদ ইয়াসিরঃ

তালেবানের একজন উল্লেখযোগ্য আলেম শাইখ উস্তাদ ইয়াসির যিনি ২০০৯

সাল থেকে পাকিস্তান কারাগারে বন্দি রয়েছেন, তিনি বলেন, "(কুফফারদের ক্ষেত্রে) ইসলামের স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে। হারবী কাফির হল তারা, যারা যেকোনোভাবে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। হারবী কাফির কারা? এমন কাফির যারা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। তারা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য হারবী কাফির হিসেবে বিবেচিত। তখন পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে বসবাসরত মুসলিমের জন্য তাদের (হারবী কাফিরদের) সাথে মৈত্রী করার, তাদের সাথে চুক্তি করার, তাদেরকে সাহায্য করার, তাদেরকে অভিবাদন (সালাম) জানানোর, তাদের সাথে ব্যবসা করার, তাদের থেকে ক্রয়বিক্রয় করার অধিকার নেই। কেননা এইরকম কাফিররা হল যুদ্ধরত শত্রু, তাই তাদের সাথে শত্রুর মতই আচরণ করা হবে। যেমন- তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যায় হত্যা করা হবে, তাদের রক্ত মুসলিমদের নিকট হালাল, তাদের সম্পদকে যুদ্ধের গনিমত হিসেবে নেওয়া হবে এবং তাদের পরিবারকে দাসদাসী হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এগুলো (হারবী কাফিরদের ক্ষেত্রে) ইসলামের ফিক্বহী বিধান। তাই এই ধরনের কাফিরদের প্রতি নম্রতা দেখানো ইসলামে হারাম। অন্যথায় এটা হবে মুসলিমদের জন্য আত্মসমর্পণ এবং পরাজয় মেনে নেওয়ার নামান্তর।" আর মোল্লা দাদুল্লাহ رحمه الله তো বলেছেন, যে আমেরিকা ও আফগান সরকারের সাথে চুক্তি করার কথা বলবে তাদের সাথে সাথে তার মাথাও কেটে ফেলা হবে।

কুফফার জাতি–গোষ্ঠির সাথে তালেবানের কথিত চুক্তিকে যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির সাথে তুলনা করে তাদের আসল চেহারাঃ

তালেবান নেতারা আমেরিকার সাথে চুক্তি করেছে এই মর্মে যে, তালেবান এমন কাউকে আফগানের ভূমি ব্যবহার করতে দিবে না যারা আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে হুমকি স্বরূপ। এর বিপরীতে আমেরিকা ও তার মিত্র ন্যাটো জোট আফগান থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে। কাফিরদের মোড়ল আমেরিকা ও তার মিত্র গোষ্ঠীগুলো যেমন- ন্যাটো জোট, এরা সবাই হারবী কাফিরদের

অন্তর্ভুক্ত। তালেবানের একজন আলেমের বক্তব্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সেখানে তিনি হারবী কাফিরদের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা আপনারা লক্ষ্য করেছেন। পৃথিবীর কোন প্রান্তে যদি কোন কাফির মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তাহলে ঐ কাফিরকে হারবী কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। আমেরিকা ও তার মিত্ররা যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত তা প্রমাণসহ উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এমন হারবী কুফফার জাতি-গোষ্ঠির সাথে চুক্তি করেছে তালেবান। আর হক্ব হতে বিচ্যুত এবং সালফে সালেহীনদের পথ থেকে বিচ্যুত জিহাদের দাবিদার কোন কোন দল ও কোন কোন ব্যক্তি তালেবানের রিদ্দামূলক চুক্তিকে হুদাইবিয়ার সন্ধির সাথে তুলনা করার মত জঘন্যতম কাজ করেছে। এই কথিত চুক্তিকে ফাতহে মুবীন হিসেবে চিত্রায়িত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। আমরা আপনাদেরকে সাথে নিয়ে এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করব, তা হল- তালেবানের এহেন রিদ্দামূলক এই চুক্তি কেন জিহাদের দাবিদার কিছু দল এবং কিছু সংখ্যক সাধারণ মুসলিমের চোখে বিজয় হিসেবে ধরা দিল? কী সেই কারণ? যে বিষয়টা আল্লাহর দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল সেই বিষয়কে কেন কিছু মানুষ বিজয় মনে করবে? যেখানে মুসলিমদের কাছে দ্বীন ত্যাগী এবং বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কথা ছিল সেখানে দেখা গেল ঠিক তার উল্টো চিত্র! কিন্তু কেন? এ বিষয়টিই আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করব ইনশা'আল্লাহ।

দ্বীনের মূলনীতির ব্যাপারে আপোষকামী হওয়াঃ

আমি প্রথমেই এই বিষয়টি স্পষ্ট করে নিতে চাই যে, আমাদের এবারের আলোচনা তালেবানের চুক্তি নিয়ে নয় বরং আমাদের আলোচনা তাদেরকে নিয়ে যারা তালেবানের চুক্তিকে ফাতহে মুবীন মনে করে এবং হুদাইবিয়ার সন্ধির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করে। তালেবানের এই কথিত চুক্তির শারয়ী হুকুম একেবারে স্পষ্ট এবং এর সম্পাদনকারীদের হুকুমও স্পষ্ট। যেহেতু আমরা এখানে তাদের ব্যাপারে শারয়ী আহকাম বর্ণনা করার দিকে যাচ্ছি না তাই আমরা তালেবানের ব্যাপারে

শারয়ী আলোচনা বাদ দিয়ে যারা তালেবানের চুক্তিকে বিজয় মনে করে তাদের দিকে মনোনিবেশ করব–যদি আল্লাহ সহায় হোন।

আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা 'আসলুদ-দ্বীন'[20] এর অন্তর্ভুক্ত তথা আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করা আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বর্তমানে তালেবান ও তার অথর্ব অনুসারী-সমর্থকরা কল্পিত মাসলাহার জন্য দ্বীনের মহান একটি মূলনীতিতে আপোষ করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যস্ত। তারা নির্যাতিত মুসলিমদের বর্জন করেছে। বর্বর চীনাদের সাথে তালেবানের বন্ধুত্ব করাকেই সমর্থন জানিয়েছে। তালেবানের অনুসারী ও সমর্থকরা নির্যাতিত মুসলিমদের বর্জনকারী এবং নির্যাতনকারী বর্বর চীনাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের সমর্থন করতে গিয়ে দ্বীনের মূলনীতিতে আপোষ করেছে। তালেবানের উচিৎ ছিল যারা মু'মিন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করা যা আসলুদ-দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। তালেবান সেটা করেনি বরং বিপরীত করেছে, কাফির মুশরিকদের সাথে ওয়ালা করেছে, মুসলিমদের বর্জন করেছে। এই বিষয়টি আপনারা সকলেই জানেন যে, চীন এমন কারো সাথে সুসম্পর্ক রাখে না যারা উইঘুরে নির্যাতিত মুসলিমদের ব্যাপারে

---

[20] সিলসিলাহ'এ ইলমিয়্যাহ'র দ্বিতীয় হালাক্বা থেকে উদ্ধৃতি- আসলুদ-দ্বীন হল আল্লাহকে স্বীকৃতি দেওয়া, এককভাবে আল্লাহ সুবহানাহুর ইবাদাত করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর ইবাদাত বর্জন করা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহুর সাথে শিরক করে তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিঃ) বলেন, "ইবরাহীম ও মুসা উভয়েই আসলুদ-দ্বীন পালন করেছেন। তা হল আল্লাহকে স্বীকৃতি দেওয়া, এককভাবে তার ইবাদাত করা - যার কোন শরীক নেই এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কুফরি করে তার সাথে শত্রুতা করা।" [মাজমুউল ফাতাওয়া - ১৬/২০৩] "যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহুর সাথে শিরক করে তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা" শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ এটাকে এখানে এই কথায় ব্যক্ত করেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কুফরি করে তার সাথে শত্রুতা করা"। তাই এই দুই ইবারতের (বর্ণনা) অর্থ একই - মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করা এবং তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিঃ) বলেন, "আসলুদ-দ্বীন হল আল্লাহর জন্য ভালবাসা, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা, আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করা, আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা এবং আল্লাহর জন্যই ইবাদাত করা।" [মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নববীয়্যাহ- ৫/২৫৫]

কথা বলে। কাফির বা মুসলিম যেই উইঘুর ইস্যুতে সোচ্চার তাদের সাথে চীনের বৈরিতা রয়েছে। তালেবানের অনুসারী-সমর্থকেরা তালেবানের রিদ্দামূলক কর্মকাণ্ডগুলোকে বৈধ করতে গিয়ে ওয়ালা-বারা'র মত দ্বীনের মূলনীতিকে ছুড়ে ফেলে দিতে একবারও ভাবেনি।

তালেবান আমেরিকার সাথে চুক্তি করেছে যে, দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণকে নির্মূল করবে এবং কুফফার ও তার দোসরদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার মত কোন ধরনের কাজ আফগানিস্তানে হতে দেবে না। তালেবানের অনুসারী আল-কায়দাকেও আফগানে জায়গা দিবে না। তাদের বিরুদ্ধেও অ্যাকশন নিবে। এক কথায় বহিরাগত এবং ভিতরগত কাউকেই কুফফারদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার কোন সুযোগ দিবে না। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু আদেশ করেছেন সাধ্যমত প্রস্তুতি নিতে আল্লাহ এবং তার রাসুলের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য। তাহলে আল্লাহর মানশা হল কাফিরদের ভীত করা, সন্ত্রস্ত করা আর তালেবান এ কাজ তো করেই না আবার অন্য কেউ করবে সেই সুযোগও দিবে না। তালেবান দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কাফিরদের সাহায্য-সহযোগিতা করছে। আল-কায়দার সাবেক আমির আইমান আয-যাওয়াহিরীকে কাবুলে হত্যা করল আমেরিকা। তালেবান এই ঘটনার জন্য শুধু একটি প্রেস ব্রিফিং দিল আর কিছুই নয়। সাধারণত প্রচলিত অন্য তাগুতী রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরে যেকোনো সামরিক হামলার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। কিন্তু তালেবান দায়সারা একটি বিবৃতি দিয়ে ক্ষ্যান্ত থেকেছে। তালেবান সমর্থকেরা দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের হত্যার মাধ্যমে কুফফারদের সন্তুষ্টি অর্জন করাকে বৈধ মনে করছে। কারণ তারা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র আক্বীদাহ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র আক্বীদাহ থেকে সরে যাওয়ার কারণেই তালেবানের শাসনামলে খোদ আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে আল-কায়দার আমীরকে আমেরিকা হত্যা করার পরেও তালেবানের অনুসারী-সমর্থকেরা মুখে কুলুপ এটে বসেছিল। আজ মুসলিমদের এই অধঃপতন হল কিভাবে আর এর কারণই বা কী? এই অধঃপতনের অন্যতম কারণ হল- পৃথিবীব্যাপী মুসলিমদের শক্তি-ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই

কুফফাররা মুসলিমদের উপর রাজত্ব করতে থাকে। তারা শুধু মুসলিমদের ভূমির উপরই রাজত্ব করেনি বরং ওরা উম্মাহ'র অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমাদের মন-মস্তিষ্ক এবং আক্বীদাহ-বিশ্বাসের মাঝেও ওদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছে। পুরো মুসলিম উম্মাহ'কে কাফিররা মনস্তাত্ত্বিকভাবে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রেখেছে। এজন্যই ওই কাফিররা আমাদের ভূমিগুলো দৃশ্যমানভাবে ছেড়ে গেলেও মনজগতে এরা সাধারণ মুসলিমদের উপর রাজত্ব করে যাচ্ছে। তাই আপনি দেখবেন মুসলিমরা আজ ওই সকল কুফফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করবে তো দূরে থাক বরং ওদেরকে নিজেদের আদর্শ বানিয়ে ফেলেছে। কুফফারদের ভাষায় কথা বলছে, ওদের শিষ্টাচারকে নিজের করে নিয়েছে। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ওদের মিডিয়া যা উগড়ে দিচ্ছে তাই গিলছে। বর্তমানে যে দেশগুলোকে আমরা মুসলিমদের দেশ হিসেবে জানি, প্রায় এর সবগুলোই কাফিরদের দৃশ্যমান জবরদখলে ছিল ১০০ থেকে ২০০ বছর বা এরো বেশি কিছু বছর ধরে। এই দীর্ঘ বছরগুলোতে দ্বীনের মূলনীতিসমূহের উপর যেমন আঘাত এসেছে তেমনি আঘাত এসেছে শিষ্টাচারের উপর। সাধারণ মুসলিমগণ প্রাশ্চাত্যের কুফফারদের চাহিদামত কিছু নিয়ম নীতি বা রীতিনীতিকেই ইসলাম মনে করে বসে আছে। কাফির গোষ্ঠীগুলো ইসলামের যে বিষয় অপছন্দ করে তারাও সেগুলো অপছন্দ করে। কাফিররা ইসলামের যে বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে বা বর্বর বলে অথবা মধ্যযুগীয় হিসেবে আখ্যা দেয় সেগুলোকেই তারা বর্জন করে। আর এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ একটি মহান জাতি হারিয়ে ফেলেছে নিজস্ব স্বকীয়তা, হারিয়েছে ঈমান-আক্বীদাহ, ভুলে গেছে নিজেদের সোনালী ইতিহাস।

এই জাতির দৈন্যদশা এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কুফফারদের প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করার মত ক্ষমতাটুকুও নেই। তাইতো আল-ওয়ালা ওয়াল -বারা'র মত দ্বীনের মহান মূলনীতিকে পিছনে ফেলে কুফফারদের অঙ্কিত সীমানার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করতে দেখা যায়। এই কুফফার মোড়লদের আঁকিবুঁকি করা সীমানাই হয়ে গেছে উম্মাহ'র জাতীয়তার পরিচায়ক। জাতীয়তার পরিচয়

বহনকারী এই সীমানাই মুসলিমদের ওয়ালা বারা'র মাপকাঠি। কুফফারদের অঙ্কিত যে সীমানার ভিতরে যার জন্ম সেটাই তার দেশ এবং একই সীমানার ভিতরে আরো যারা আছে তারা তার ভাই -যদিও তারা কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদী, রাফিদী বা শিখ হয় অথবা অন্য যেকোনো দ্বীনেরই হোক না কেন। বিপরীতে কুফফারদের অঙ্কিত সীমানার বাইরে যে আছে সে এর থেকে ভিন্ন। সীমানার ওপারের কোন ব্যক্তির ব্যাপারে সীমানার এপারের মুসলিমদের কোন জবাবদিহিতা নেই। সে নির্যাতিত হবে হোক এতে সীমানার ওপারের মুসলিমদের কিছু করার নেই! কারণ সে অন্য রাষ্ট্রের বা অন্য সীমানার অন্তর্ভুক্ত। তার সমস্যা, তার নির্যাতিত হওয়া, তার নিপীড়িত হওয়া এটা ঐ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। সে সীমানার ওপারের হয়ে কোন একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে হস্তক্ষেপ করবে না বা করে না। ফিলিস্তিনে ইহুদীরা হামলা চালাবে আর তাদের করণীয় শুধু বিবৃতি দিবে, সমবেদনা জানাবে। আর বলবে এটা একটা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার! উইঘুরে আমাদের ভাই -বোন নির্যাতিত হবে আর তালেবান বলবে এটা চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং সাথে সাথে বাণিজ্য থেকে নিয়ে সবরকম সম্পর্ক করবে। আহ আফসোস! তারা এ কেমন ফায়সালা করে? কাফির মুশরিকরা এটাই চায় যে, আমরা যেন আমাদের নিজেদের পরিচয় ভুলে যাই। আমরা মুসলিমরা একে অপরের ভাই - চাই সে যেকোনো দেশের হোক যেকোনো ভাষায় কথা বলুক সে আমার ভাই, তার দুঃখ আমার দুঃখ, তার সমস্যাই আমার সমস্যা, তার উপর আঘাত মানে আমার উপরে আঘাত। কাফিররা চায় আমরা যেন দ্বীনের মূলনীতিতে আপোষ করি।

রাসুল ﷺ বলেছেন, “এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না, তাকে সাহায্য করা পরিত্যাগ করবে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করবে না।” ওরা চায় আমরা যেন রাসুলের এই বাণী বাস্তবায়ন না করি। কাফিররা চায় যে, তারা উইঘুরে মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালাবে আর তালেবানের অনৈসলামিক ইমারত নির্যাতিত মুসলিমদের উদ্ধারের কোন চেষ্টা করবে না। উপরন্তু তারা আবার চীনের সাথে ভালো সম্পর্ক করছে। আমাদের সাধারণ মুসলিমদের গাইরত এতটা বিলিন হয়ে গেছে যে, তারা একে বৈধ মনে করে। আল-ওয়ালা

ওয়াল-বারা সম্পর্কে নুন্যতম জ্ঞানটুকু নেই বেশিরভাগের। আর যারাও কিছুটা জ্ঞান রাখে তারা নিজেদের স্বার্থে দ্বীনের এই মূলনীতিকে সবচেয়ে বেশি অপব্যাখ্যা করে এবং বিকৃত করে। পরাজিত মানসিকতার লোকজন বিশেষভাবে তালেবান ও তালেবানের সমর্থকরা কোন কিছু হাসিলের জন্য সর্বপ্রথম এবং খুব সহজেই দ্বীনের যে বিষয়টা বিলিয়ে দেয় তা হল আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা। যারাই ওয়ালা বারা নিয়ে আলোচনা করে কুফফাররা তাদের সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী হিসেবে চিহ্নিত করে। কাফিররা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে মুসলিমরা যেন অসাম্প্রদায়িক হয়। কাফিরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা বন্ধ করে।

প্রিয় পাঠক! যারা তালেবানের চুক্তিকে বিজয় মনে করে তারা আসলে কুফফারদের অঙ্কিত পথেই চলছে। তারা মনে করছে যে, ব্রিটিশ কাফিরদের আঁকা সীমানায় ঘেরা আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা ও তার মিত্র কুফফার জাতি-গোষ্ঠীগুলো চলে যাওয়াটাই বিজয় যদিও পৃথিবীব্যাপী অন্যান্য ভূখণ্ডসমূহে আমেরিকা ও তার মিত্রদের আগ্রাসন অব্যাহত থাকে। তারা মনে করে তালেবানের রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করাই মুখ্য বিষয়—এটা করতে গিয়ে তালেবান মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করছে কি না তা তাদের কাছে গৌণ। তাদের কাছে এটাও গৌণ যে, তালেবান রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করতে গিয়ে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'কে বিসর্জন দিয়েছে, কুফফারদের সাথে সুস্পষ্ট ওয়ালা করছে। এগুলো কোন বিষয়ই না! যারা তালেবানের চুক্তিকে বিজয় হিসেবে দেখে তারা মনে করে তালেবানের রাষ্ট্র পরিচালনা করাই প্রধান লক্ষ্য—যদিও তালেবানের পরিচালিত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় সাহাবীদের গালি দেওয়া হয়, তারপরেও তালেবান বিজয়ী! যদিও তালেবানের নিরাপত্তায় হুজুরে পাক ﷺ এর সম্মানে আঘাত করা হয় এবং উম্মুল মু'মিনীনের শানে গোস্তাখি করা হয়—যা করে থাকে আফগানিস্তানে রাফিদীরা! তথাপি কিছু মানুষ মনে করে তালেবান বিজয়ী! যেখানে প্রত্যেক ঘরে ঘরে এবং প্রত্যেকটি রাফিদী মন্দিরে প্রকাশ্যে সাহাবীদের অভিসম্পাত করা হয়, তাকফীর করা হয় এবং আমাদের আম্মাজান আয়িশা رضي الله عنها কে যিনার অপবাদ দেওয়া হয়, লা'নত করা হয় আর তালেবান তাদেরকে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে থাকে! অপরদিকে

তালেবানের সমর্থকরা একেই বিজয় মনে করে! আপনি ভেবে দেখেছেন কি কতটা আত্মমর্যাদাহীন হলে ও দ্বীনের মূলনীতিতে কতটা আপোষকামী হলে এহেন লাঞ্ছনাদায়ক বিষয়গুলোকে বিজয় মনে হতে পারে!! নির্যাতিত মুসলিমদের উদ্ধারের চেষ্টা তো করেইনি বরং নির্যাতনকারীদের সাথে হাত মিলিয়েছে। এটাকেও যারা বিজয় মনে করে তারা দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কে বোঝে এমন মনে করার কোন সুযোগ আছে? ফিলিস্তিনে ইহুদীদের হামলা এখনো চলমান আছে আর তালেবান তাদের দেশে উৎপাদিত আনার জাতীয় পানীয় যুদ্ধ চলমান থাকা অবস্থায়ই আমেরিকায় রফতানি করছে। তালেবানের সমর্থকরা এটাতে কোন সমস্যাই দেখতে পায় না, কারণ আমেরিকা তো আর আফগানিস্তানে যুদ্ধ করছে না। তাই তালেবান আমেরিকায় রফতানি করতেই পারে! আমেরিকা ফিলিস্তিনে হামলায় সহযোগিতা করছে আর আফগানিস্তানে হামলায় তো আর সহযোগিতা করছে না! আসলুদ-দ্বীনের ক্ষেত্রে আপষকারী প্রজন্ম কি আর এতো কিছু বুঝবে! তারা শুধু বুঝবে যে, তাদের ধারণাপ্রসূত মাসলাহার জন্য দ্বীনের কোন কোন বিষয়কে কুরবানি দেওয়া যায়! যারা জনগণের সন্তুষ্টিকে নিজেদের লক্ষ্য বানিয়েছে তাদের কাছে দ্বীনের মহান মূলনীতি গুরুত্বহীন হবে এটা অস্বাভাবিক কি বিষয়? ওয়ালা বারাহীন এই জাতি তালেবানের বিশ্বাসঘাতকতা ও পরাজয়কেই বিজয় মনে করবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই! উম্মাহ'র সাথে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতাকারী নির্দয় ও নিষ্ঠুর জঘন্যতম শত্রু রাফিদীরা। মুসলিম জাতির সাথে ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটা বর্বর হত্যাযজ্ঞের সাথে রাফিদীরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। মঙ্গলদের দ্বারা বাগদাদে গণহত্যা চালানোর ক্ষেত্রে ওদের সহযোগিতা করেছে রাফিদীরা। আমেরিকা ইরাকে আগ্রাসন চালানোর পর সহযোগিতা করেছিল এই রাফিদীরা। এখন পর্যন্ত সকল আগ্রাসী শত্রুর সাথে আতাত করে মুসলিমদের উপর সব ধরনের বর্বরতা চালানো অব্যাহত রেখেছে। ইরানে মুসলিমদের উপর যুগের পর যুগ ধরে সীমাহীন নির্যাতন চালিয়ে আসছে। ইরাকেও চলছে তাদের বর্বরতার স্ট্রীম রোলার। ইয়েমেনেও মুসলিমদের দুর্ভোগের কারণ এই রাফিদীরাই। রাফিদীদের এতো এতো কুকর্ম সত্ত্বেও যখন তালেবান রাফিদীদের রাষ্ট্র ইরানের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে এবং বিভিন্ন পারস্পারিক চুক্তি করে তখন দ্বীনের মূলনীতিতে আপোষকারী ব্যক্তি বা

গোষ্ঠীরাই নির্লজ্জভাবে তা প্রচার চালায়। আমি আশাকরি পাঠক বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, আসলুদ-দ্বীনের ক্ষেত্রে আপোষকারী কোন ব্যক্তিই কেবল তালেবানের কথিত চুক্তিকে বিজয় বলতে পারে! তুলনা করতে পারে হুদাইবিয়ার সন্ধির সাথে।

তালেবানের রিদ্দামূলক চুক্তিকে হুদাইবিয়ার সন্ধির সাথে তুলনা করার কি কোন যৌক্তিকতা আছে?

আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আপোষ করা কিছু লোক নিজেদের বিকিয়ে দেওয়া আদর্শের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে সবসময়ই হুদাইবিয়ার সন্ধির অপব্যাখ্যা করে থাকে। দ্বীনের মূলনীতি আল-ওয়ালা ওয়াল-বারাকে উপেক্ষা করে। কর্মের মাধ্যমে ওয়ালা-বারাকে পরিপূর্ণরূপে পদদলিত করে। এরা আল্লাহর শত্রু ও কাফিরদের একান্ত বাধ্য এবং অনুগত দাস। নিজেদের পছন্দসই বিষয় তুলে ধরে ইচ্ছামত যুক্তি ও অজুহাত দার করাতে সিদ্ধহস্ত এরা। আর তালেবানের অনুসারীরা একাজগুলোই করে থাকে। তাই তারা এসবকিছুর স্বপক্ষে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে। আল্লাহর দ্বীনের অপব্যাখ্যাকারী তালেবানের অনুসারীরা কুফফারদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব করা ও নতজানু আদর্শের পক্ষে হুদাইবিয়ার সন্ধির খণ্ডিত চিত্রকে বিকৃত করে সাধারণ মুসলিমদের সামনে তুলে ধরে। তাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দ্বীনের মূলনীতির ব্যাপারে আপোষ করা। আমরা সালাফগণের বক্তব্য উল্লেখ করে বুঝানোর চেষ্টা করব যে, তারা কিভাবে উম্মাহ'কে ধোঁকায় ফেলেছে এবং রাসুল ﷺ এর বরকতময় সন্ধিকে কিভাবে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

আমরা দেখেছি, তালেবান যখন এই কুফরি শর্ত রেখে আমেরিকার সাথে চুক্তি সম্পন্ন করেছে তখন আল-কায়দার মত সংগঠন এই চুক্তিকে ফাতহে মুবীন বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা এই চুক্তিকে মুশরিকদের সাথে আল্লাহর রাসুল ﷺ এর হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিকে তুলনা করে। অথচ আমরা জানি যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি যে শর্তের আলোকে হয়েছিল সেগুলো কেবলমাত্র আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ এর জন্য খাছ ছিল। আল্লাহর রাসুল ﷺ এর পরে এই ধরনের চুক্তি আর কারো জন্য করা জায়েয নেই। এটা কি শুধুই আমাদের বক্তব্য? না, বরং এটা সালাফগণের

বক্তব্য।

ইবনে হাযম رحمه الله আবু জান্দালের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, "নাবী ﷺ ঐ সময়ে মুসলিমদের মধ্য থেকে কাউকে কাফিরদের নিকট ফিরিয়ে দেননি তবে আল্লাহ عز وجل তাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে ফিতনায় পতিত হবে না এবং তারা নিশ্চিতভাবেই মুক্তি পাবে।" অতঃপর তিনি নাবী ﷺ এর উক্তি উল্লেখ করেন, "আমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাদের নিকট চলে যাবে আল্লাহ তাকে দূরে রাখবেন। আর তাদের মধ্য থেকে আমাদের নিকট যে আসবে আল্লাহ অচিরেই তার জন্য একটি উপায় ও সুযোগ তৈরি করে দিবেন।" ইবনে হাযম বলেন, "আল্লাহ عز وجل নাবী ﷺ এর গুণ বর্ণনা করে বলেন,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۞

"আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা কেবলই ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়।" আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, নাবী ﷺ এর ঐ সংবাদ দেওয়া কুরাইশ কাফিরদের থেকে যে আসবে আল্লাহ তার জন্য অচিরেই একটি পথ ও উপায় তৈরি করে দিবেন–এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য ওহী। তাই সন্দেহাতীতভাবেই দুনিয়া ও আখিরাতের অপছন্দনীয় বিষয় থেকে ঐ ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে, যে তাদের মধ্য থেকে নাবীর নিকট আসবে। এমনকি কাফিরদের কবল থেকে তার মুক্তি হবে। একজন দূরদর্শী মুসলিম সন্দিহান হবে না। আর এটা এমন এক বিষয় যা নাবী ﷺ ব্যতীত মানুষের মধ্য থেকে কেউ জানবে না।" অতঃপর তিনি - অর্থাৎ ইবনে হাযম বলেন, "কোন মুসলিমের জন্য এই শর্তে শর্তযুক্ত করা বৈধ নয় এবং এই শর্ত পূরণ করাও বৈধ নয়। কারণ তার নিকট কোন ইলমুল গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান নেই যা আল্লাহ তার রাসুলের প্রতি ওহী করেছিলেন।"[21]

এমনিভাবে কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী رحمه الله বলেন, "যে ব্যক্তি মুসলিম

[21]আল-ইহকাম ফী-উছুলিল আহকামঃ ৫/২৬

হবে তাকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে—এই চুক্তি করা নাবী ﷺ -এর পরে কারো জন্য জায়েয নেই। আল্লাহ এটাকে তার জন্য জায়েয করেছিলেন কারণ তিনি এব্যাপারে হিকমাহ জানতেন এবং মাসলাহার কারণে ফায়সালা করেছেন।”[22]

সমসাময়িক একজন আলেম আহমাদ মুসা জিবরীল حفظه الله হুদাইবিয়ার সন্ধির আলোচনা করে বলেন, “আমি সর্বোপরি এ বিষয়ে (হুদাইবিয়ার সন্ধির বিষয়ে) দুইটি মত তুলে ধরছিঃ

- ১. ঐ সময়ে রাসুল ﷺ এর জন্য সেটি খাস বিধান ছিল। তিনি ব্যতীত আর কেউ এটা করতে পারবে না। সম্মানিত আলেমগণ বিভিন্ন উপায়ে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। হাদিসের যে শর্ত উল্লেখ ও পর্যালোচনা করেছি, তা এ বিষয়কেই সমর্থন করে।
- ২. দ্বিতীয় মত হলো এই বিধান রহিত হয়ে গেছে। এর সমর্থনে অসংখ্য আলেম বিভিন্ন উপায়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন।”[23]

কিভাবে আল-কায়দা এই ধরনের চুক্তিকে হুদাইবিয়ার সাথে তুলনা দিতে পারে? যেখানে চুক্তির অন্যতম শর্তই ছিল মুসলিম মুওয়াহহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

আসলেই দাওলাতুল ইসলাম কি আসলী কুফফারদের সাথে চুক্তি করা যাবে না—এমন নীতি লালন করে?

কেউ কেউ দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে বলে থাকে যে, দাওলাতুল ইসলাম আসলী কাফিরদের সাথেও চুক্তি করার বিরোধী, অথচ ইসলামে তো আসলী কাফিরদের সাথে চুক্তির কথা বলা আছে। আর আমেরিকা হচ্ছে আসলী

[22] আহকামুল কুরআন লি ইবনে আরাবীঃ ৪/২৩১

[23] "The Treaty of Hudaybiyyah : Falsehood vs Facts"

কাফির। সুতরাং এখানে সমস্যা কোথায়?

দাওলাতুল ইসলাম প্রথমত কুরআন ও সুন্নাহ'র বক্তব্যকে অনুসরণ করে। এরপর কুরআন এবং সুন্নাহ'র বুঝ থেকে নেওয়া সালাফগণের বক্তব্যকে অনুসরণ করে। আর এই শতাব্দীর জিহাদের ময়দানে আমাদের সালাফ হচ্ছে শাইখ উসামা, আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী, আনওয়ার আল-আওলাক্বী, আবু ইয়াহইয়া আল-লিব্বী এবং মোস্তফা আবুল ইয়াযীদের মত তারকা সদৃশ ব্যক্তিরা। আল-কায়দার প্রথম সারির অন্যতম একজন হলেন মোস্তফা আবুল ইয়াযীদ رحمه الله - মোস্তফা আবুল ইয়াযীদ رحمه الله কে সেই একই প্রশ্ন করা হয়েছিলো। সাংবাদিক শাইখকে জিজ্ঞাসা করেছিল, *“আপনি কি মনে করেন, আমেরিকার সাথে আল-কায়দার আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ হওয়া সম্ভব?”*

শাইখ বললেন, “কেন সম্ভব হবে না। আমেরিকা যখন আমাদের শর্তগুলো মেনে নিবে। আর সেগুলো হলঃ

- তারা মুসলিমদের দেশগুলো থেকে বের হয়ে যাবে।
- তারা ফিলিস্তিনে দখলদার ঘোরাওকারী ইহুদীদেরকে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করবে।
- তারা মুসলিমদের দেশগুলোতে অবস্থানরত মুরতাদ সরকারদেরকে সমর্থন করা বন্ধ করবে।
- তাদের কারাগারগুলো থেকে বন্দিদের মুক্তি দিবে।

যখন তারা এ শর্তগুলো মেনে নিবে তখন আমাদের মাঝে আর তাদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ হবে। কিন্তু এটা স্থায়ী সময়ের জন্য হবে না। অর্থাৎ সন্ধি হবে যেমন ধরুন দশ বছরের জন্য। আর আমরা তখন তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করব। সেসময় যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে চিরকালের জন্য আমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে - আর আমরা দাওলাতুল ইসলাম, দাওলাতুল খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে যাচ্ছি

ইনশা'আল্লাহ। অতঃপর আমরা তাদেরকে নতুন করে আবার ইসলামের দিকে আহ্বান করব। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তখন আমরা তাদেরকে ইসলামের হুকুম জিযয়া প্রদানে বাধ্য করব। আর ইসলামের এই পদ্ধতিতেই আমেরিকানদের সাথে এবং অন্যদের সাথে সন্ধি হবে। আমরা মনে করি না যে, তারা এ বিষয়টি অনুধাবন করবে। আর উম্মাতে ইসলামের উপর আবশ্যক হচ্ছে তারা এই পথকেই গ্রহণ করবে– তা হচ্ছে শক্তি অর্জন করা এবং আল্লাহ ﷻ এর পথে জিহাদ করা।"[24]

এটাই ছিল আল-কায়দা। আর এরাই ছিল আল-কায়দার প্রথম প্রজন্ম এবং নক্ষত্ররাজি। দাওলাতুল ইসলাম এদের মত নক্ষত্ররাজিদেরকেই অনুসরণ করে। কিন্তু আফসোস! আজকের আল-কায়দা কোথায় গেল! আমেরিকা কি মুসলিমদের দেশগুলোতে হামলা চালানো বন্ধ করেছে? আজো আমেরিকা ইরাক, শাম, ইয়েমেন, সোমালিয়াতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আমেরিকা কি ফিলিস্তিনের দখলদার ইহুদীদের সমর্থন দেওয়া বন্ধ করেছে? নাকি এখনো আমেরিকা ইহুদীদের পক্ষে সমর্থনে সবকিছুই করে যাচ্ছে। মুসলিমদের দেশগুলোতে অবস্থানরত মুরতাদ শাসকদের সমর্থন দেওয়া কি আমেরিকা বন্ধ করেছে? নাকি সবমসময় তাদের সমর্থন করেই যাচ্ছে! তাহলে কিসের ভিত্তিতে তালেবান আমেরিকার সাথে চুক্তি করল? আর কোন শারয়ী নীতির আলোকে আল-কায়দা এই চুক্তিকে ফাতহে মুবীন বলল?!

আমরা দেখেছি, তালেবান আমেরিকার সাথে চুক্তি করার পরপরই আল-কায়দার সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে যেখানে তারা তালেবানের এই চুক্তিকে ফাতহে মুবীন হিসেবে উল্লেখ করেছে। তাহলে শাইখ উসামা এবং মোস্তফা আবুল ইয়াযীদের আল-কায়দা আর যাওয়াহিরী এবং সাইফ আল-আদেলের আল-কায়দার মাঝে তো বিস্তর ফারাক পরিলক্ষিত হয়! আমরা শাইখ উসামার এবং মোস্তফা আবুল ইয়াযীদের আল-কায়দাকেই অনুসরণ করি। তাইতো আমরাও বলি, আমেরিকা যতদিন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের পক্ষে সমর্থন দিবে, যতদিন আমেরিকা মুসলিমদের কোন একটি ভূখণ্ডে হামলা চলমান রাখবে এবং মুসলিমদের

[24] আল-জাজিরা চ্যানেলকে দেওয়া শাইখ মোস্তফা আবুল ইয়াযীদের সাক্ষাৎকার

দেশগুলোতে তাগুত মুরতাদ সরকারদের সমর্থন দিতে থাকবে ততদিন আমরা আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করেই যাবো এবং তাদের সাথে কোন চুক্তি হবে না। আর যেদিন আমেরিকা ফিলিস্তিনে ইহুদীদের পক্ষে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করবে, মুসলিমদের উপর হামলা বন্ধ করবে এবং মুরতাদ সরকারদেরকে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করবে সেদিনই আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করব এবং সন্ধি চুক্তি নিয়ে আলোচনা করব। কারণ এটাই ইসলামের নির্দেশনা। আল-কায়দার কর্মপন্থাও এমনই ছিল। কিন্তু ডাক্তার যাওয়াহিরী শাইখ উসামার আল-কায়দাকে কোথায় নিয়ে গেল!

সুতরাং দাওলাতুল ইসলাম আসলী কাফিরদের সাথে সন্ধি চুক্তি তখনই করবে যখন সেটা সকল শারয়ী শর্ত পালন করবে। কিন্তু আল-কায়দার উমারা তালেবানের মত শারীয়াহ বহির্ভূত পদ্ধতিতে কুফরি শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি চুক্তির পক্ষে নয়। আল্লাহর নিকট এ থেকে আমরা আশ্রয় চাই।

উইঘুরে মুসলিমদের নির্যাতনকারী চীনাদের রক্তাক্ত হাতে হাত রেখেছে তালেবানঃ

আলা-ওয়ালা ওয়াল-বারা তথা আল্লাহর জন্য সম্পর্ক করা এবং আল্লাহর জন্য সম্পর্কচ্ছেদ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব হবে মু'মিন মুসলিমদের সাথে। আর সম্পর্কচ্ছেদ ও শত্রুতা হবে কাফিরদের সাথে। আমরা দেখেছি, তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের পূর্ব থেকে একটি ঘোষণা দিয়ে আসছে যে, তালেবান আফগানিস্তানের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। একে তো হচ্ছে সুসম্পর্ক এর উপর আবার 'পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে'। তাহলে কি তালেবান চীন-রাশিয়ার কমিউনিস্ট আর ভারতের হিন্দুদের সাথে শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে? একজন কাফির কি কখনো মুসলিমের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পেতে পারে? শ্রদ্ধা তো কেবল আল্লাহ, তার রাসুল এবং মু'মিনদের জন্য। কিন্তু তালেবান এ-কী মূলনীতি গ্রহণ করল?

আফগানিস্তানের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, ভারত, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তানসহ আরো কিছু দেশ। আমরা আরো দেখি, তালেবান ক্ষমতা দখলের পর মিডিয়াতে তালেবানের নেতারা চীন, রাশিয়া, ভারত, ফ্রান্স, আমেরিকাসহ প্রভৃতি রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ঘোষণা দিয়ে আসছে। আর তালেবান নেতারা বলছে, এটা তাদের রাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তালেবান বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর মত এই বিষয়টা তাদের রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত করেছে যে, তারা সকল রাষ্ট্রের সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। এর বড় প্রমাণ হচ্ছে মিডিয়াতে তালেবানের কোন নেতাকে যেকোনো রাষ্ট্রের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেই তারা নির্দ্বিধায় বলছে, অমুক রাষ্ট্র আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। যেমনটি বলেছে, ভারত, ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রের ব্যাপারে।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে পূর্বে যে রাষ্ট্রগুলোর কথা বলা হয়েছে তারা সবাই হারবী কাফির। প্রতিটি রাষ্ট্রই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী। উইঘুর মুসলিমদের প্রতি চীনের বর্বর ইতিহাস কে না জানে?! চীন তো এখনো উইঘুর মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত নির্যাতন চালাচ্ছে। কিভাবে তালেবান চীনের সাথে এতো গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে? আমরা জানি যে, হারবী আসলী কাফির রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে চীনের সাথে তালেবানের সবচেয়ে বেশি ভালো সম্পর্ক রয়েছে। অথচ তালেবানের উচিৎ ছিল চীনের সাথে সর্বপ্রথম উইঘুর মুসলিমদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করা। আমরা আব্বাসী খিলাফাহ'র সময়ের কথা জানি যে, তারা যখন রোমের সাথে কোন চুক্তি করতেন তখন তারা কনস্টান্টিনোপলে অবস্থানরত মুসলিমদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাগ্রে রাখতেন। আজ তালেবান চীনের সাথে বহুবিধ চুক্তি করছে কিন্তু নির্যাতিত নিপীড়িত উইঘুর মুসলিমদের নিরাপত্তা নিয়ে কোন আলোচনাই তালেবান করছে না। বরং এই কাপুরুষ তালেবান উইঘুর মুসলিমদের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করবে না–সেই বিষয়টি চীনকে জানিয়ে দিয়েছে। এছাড়াও ভারত এবং রাশিয়ার ক্ষেত্রে তালেবান একই কর্মপন্থা অবলম্বন

করছে। এখানে সবচেয়ে গুরুতর বিষয় হচ্ছে এই সকল হারবী আসলী কাফির রাষ্ট্রের সাথে তালেবানের পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ঘোষণা দেয়া। আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে যদি মুসলিমদের দেশগুলোর কোন মুরতাদ সরকার আমেরিকার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ঘোষণা দিত, আমরা দেখেছি তখন আল-কায়দার শাইখরা এটাকে "মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করা" হিসেবে আখ্যায়িত করত। কিন্তু আজ তালেবান যখন মুসলিমদের নির্যাতনকারী হত্যাকারী চীন, রাশিয়া, ভারত, ফ্রান্স ও আমেরিকার সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক তৈরি করা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ঘোষণা দিয়ে তা বাস্তবায়ন করছে তখন বর্তমান আল-কায়দার শাইখরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। বরং তাদের কেউ কেউ এটাকে জায়েয করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আমেরিকাই কি কেবল মুসলিমদের নির্যাতনকারী ও হত্যাকারী এবং হারবী কাফির? চীন, রাশিয়া ও ভারত কি মুসলিমদের নির্যাতনকারী, হত্যাকারী এবং হারবী কাফির নয়? নাকি হারবী কাফির হওয়া না হওয়া তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর নির্ভর করে?

এই তো কয়েকবছর পূর্বেও ভারতীয় উপমহাদেশের আল-কায়দার সাবেক মুখপাত্র এবং বর্তমান আমীর উসামা মাহমুদ পাকিস্তানে চীনের বাণিজ্যিক বিনিয়োগের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ 'চীন বন্ধু নয়!' শিরোনামে বই লিখেছেন। সেই বইটিতে তিনি বলেছেন পূর্ব তুর্কিস্তান তথা উইঘুর মুসলিমদের নির্যাতনকারী চীনের সাথে এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক চীনের একটি আগ্রাসন এবং উইঘুর মুসলিমদের বাদ দিয়ে চীনের কমিউনিস্টদের সাথে বন্ধুত্ব করার নামান্তর।

উসামা মাহমুদ বলেছেন, *"চীনারা ভালো ভাবে জানে যে ইসলাম তাদের সংস্কৃতিকে কখনো মেনে নেবে না। তাদের নিকৃষ্ট সংস্কৃতি ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের ঠিকই জানা আছে যে, একটি হলো আগুন এবং আরেকটি হলো পানির মতো।*

এ দুইয়ের মাঝে সামান্য একটি বিষয়েও সামঞ্জস্যতা নেই। এই কারণেই এখন তাদের লক্ষ্য শুধু ব্যবসা নয়। এখানে তাদের সৈন্যদের অবস্থান করানো, চীনা

ভাষা শিখানো, চীনা রীতিনীতির প্রচলন করা, চীনা মুভির ডাবিং করা, চীনা স্কুল-কলেজের আধিক্যতা অর্জন করা, সেবার নামে চীনা মেয়েদের চাকুরীর সুযোগ করে দেওয়া ইত্যাদি।

মোটকথা, দেশ ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য তারা সর্বদিক দিয়ে আগ্রাসী আক্রমণ পরিচালনা করছে। কোন দিকই বাদ রাখছে না। **এসকল পরিমণ্ডলে চীনাদের অনুপ্রবেশকে কেউ যদি শুধু ব্যবসা ও অর্থনীতির চোখে দেখে, তাহলে তার চক্ষু ডাক্তার দেখানো ছাড়া উপায় নেই।**

আমরা মানি বা না মানি এটা অবশ্যই ইসলামের বিরুদ্ধে চীনাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। যেভাবে ইংরেজরা ব্যবসার (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) রূপ ধারণ করে প্রথমে দেশের শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। অতঃপর দেশের শিক্ষা-দীক্ষা, নিয়ম-কানুন সবকিছুই নিজেদের হাতে নিয়ে ফেলেছ। অবশেষে তারা পুরো দেশকে নিজেদের হাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে নিজেদের জন্য এক নতুন প্রজন্মের রূপ দিয়েছে। ঠিক একইরকম ভাবে ব্যবসা ও অর্থনীতির সাহায্য সহযোগিতার নাম দিয়ে নতুন এক ষড়যন্ত্রের জাল ফেলা হয়েছে। এখন পাক-চীন চুক্তির মাধ্যমে উন্নতি ও অগ্রগতির কোন বালাই নেই, বরং এতে উন্নতি ও অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হচ্ছে। এবং এই মহাসড়ক দিয়েই চীনা নাস্তিকতা ও নিকৃষ্ট চীনা-সংস্কৃতি চলে আসছে।

দ্বীনের ধারক-বাহকদের নেতৃত্বদানকারী সম্মানিত ওলামা মাশায়েখগণ! অবস্থা ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। নিজেদের উপর অর্পিত ফরজ বিষয়গুলো অনুধাবন করুন। এটা আমাদের জাতি, ধর্ম ও সভ্যতার উপর আক্রমণ। শুধু এতটুকুই পার্থক্য যে, যুদ্ধ হয় ঢাল তরবারির দ্বারা, আর তারা করছে অর্থ ও মিডিয়া দ্বারা। দেখুন এই যুদ্ধ বোঝা ও বুঝানো কোনটাই কঠিন কোন ব্যাপার নয়। **তাদের এক হাতে যেমন আছে পাকিস্তানিদের জন্য সাহায্য সহযোগিতার পতাকা তেমনি অন্য হাতে আছে বিষ-মিশ্রিত ধারালো খঞ্জর। যা তারা তুর্কীস্তানী মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে।** সুতরাং আমাদের নীরবতা ভাঙ্গতে হবে। যদি আমরা নীরব থাকি তাহলে –আল্লাহ মাফ করেন– আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

ইতিহাসও আমাদেরকে কখনো ছাড় দিবে না।

আর এটাও স্মরণ রাখা চাই যে মুসলমানদের জন্য ঐ সম্পদ কখনো কল্যাণ বয়ে আনবে না যার ভিত্তি হলো - আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও আপনজনদের রক্ত। জেনারেলরা তাদের সৈন্য দেখিয়ে যতই আপনাকে ধোঁকা দিক না কেন, বাস্তবতা এটাই যে, চীনা অর্থনীতির এই কুমির আমাদের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ গিলে ফেলবে। তারা আমাদের সাহায্য করা তো বহু দূরের কথা, আজ তাদের কারণেই আমাদের অর্থনীতি এবং আগামী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ব্যবসায়ীরা দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। আর মিল ফ্যাক্টরিগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চীন যদি আমাদের অর্থনীতিকে সহায়তা করে থাকে, তাহলে সেই সহায়তা এই যে, তারা আমাদের অর্থনীতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলেছ।” [25]

তিনি একই বইয়ের ১৩ পৃষ্ঠার শেষের দিকে এসে বলেছেন, *“আমেরিকা ও চীন উভয়েই মুসলিমদের হত্যাকারী ও চরম শত্রু। এই শয়তানদের মোকাবেলায় আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে এবং আল্লাহর রুজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। আল্লাহর শপথ! তুর্কী মুসলিমদের সাহায্যার্থে আপনি যদি শুধু আওয়াজটুকুও উঁচু করেন, তাহলেই তুর্কীতে বসবাসরত আমার মা-বোনদের কলিজা ঠাণ্ডা হবে। তাদের আবরুর হেফাজত হবে ইনশাআল্লাহ।*

তারা নিজেরা নিজেদেরকে শত দুঃখ বেদনার মাঝেও মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ মনে করবে। আপনি যদি চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঁচু করেন, তাহলে শুধু তুর্কী মুসলিমদেরই উপকার হবে না! বরং এটা পাকিস্তানি মুসলিমদের ধর্ম, স্বাধীনতা ও অর্থনীতিরও হেফাজত হবে ইনশাআল্লাহ।

আপনাদের কাছে শুধু এটাই নিবেদন যে, আপনারা আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন করুন এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করুন। এটা ঈমানের অন্যতম একটি ভিত্তি। এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন কু-ধারণা পোষণ করবেন না। আল্লাহর

[25] চীন বন্ধু নয়! প্রকাশনায়ঃ আল-হিকমা মিডিয়া- পৃষ্ঠাঃ ১২

শপথ তিনি তার বান্দাদের সাহায্য করতে সক্ষম। তিনি শক্তিশালী এবং শাস্তিদাতা। সুতরাং ঐ মহা-মহীয়ান আল্লাহর আদেশ মেনে চলুন। চীনাদের নিপীড়নে অতিষ্ঠ মুসলিমদের দুঃখ কষ্টের ঘটনাগুলো এবং তাদের দ্বীনের জন্য কুরবানির বৃত্তান্তগুলো মানুষের সামনে বর্ণনা করুন। লোকদেরকে দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে তুলন। কেননা মনে রাখবেন, শত্রুকে শত্রু হিসেবে জানা-ই হলো যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ। অন্তত প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করুন। নিজের জাতি ও আগামী প্রজন্মকে এই রণাঙ্গনের জন্য প্রস্তুত করে তুলন।"

আচ্ছা বলুন তো, কী পরিবর্তন হয়েছে? চীন কি উইঘুর মুসলিমদের উপর নির্যাতন করা বন্ধ করেছে? চীন কি মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার আগ্রাসন বন্ধ করেছে? চীন পাকিস্তানে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ করার কারণে যদি সেটা চীনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহলে আজ আফগানিস্তানে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ করার কারণে কি সেটা বন্ধুত্ব হয় না?! নাকি আল-কায়দার নিকট বিষয়টি এমন যে, তালেবান যা-ই করুক না কেন, তালেবানের জন্য সবকিছুই শারীয়াহ'তে বৈধ।

সুতরাং তালেবানের পক্ষ থেকে চীন, রাশিয়া, ভারতসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক তৈরি করা এবং পাশাপাশি আমেরিকা ও ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ঘোষণা দেওয়া স্পষ্ট তাওয়াল্লী তথা বন্ধুরূপে গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত যা সুস্পষ্ট কুফর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ۘؔ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে নিশ্চয়ই সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।"[26] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[26] সুরা মায়িদাহঃ ৫১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۝

“হে মু’মিনগণ!! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসুলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছো। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? আর তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করে সে তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।”[27] সা’দী رحمه الله বলেন, “তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও” অর্থাৎঃ তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আত্মনিয়োগ করছো। তাই যখন বন্ধুত্ব অর্জন হয় তখন এর সাথে যুক্ত হয় সাহায্য এবং সম্পর্ক। ফলে বান্দা ঈমান থেকে বের হয়ে যায় এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় ও ঈমানদারদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।”[28]

বর্তমানে তালেবানের গায়রত নেই বললেই চলে! আমরা সকলেই জানি যে, আমেরিকা যখন ২০০১ সালে আফগানিস্তানে হামলা করেছিল তখন আমেরিকাকে মুসলিম মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে মুরতাদ পাকিস্তান সরকার। আমরা দেখেছি, মুজাহিদদের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে মুসলিমা বোন আফিয়া সিদ্দীকার মত কতশত নারী-পুরুষকে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছে

[27] সুরা মুমতাহিনাঃ ০১

[28] তাফসীরে সা’দী

পাকিস্তান সরকার। মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশেষত এই তালেবানের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাহায্য করার ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। পাশাপাশি তালেবানের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তুরস্ক ও কাতারের ভূমিকাও কম ছিল না। যাদের শারীয়াহ সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞান আছে তাদের সকলের কাছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করার হুকুম স্পষ্ট। **হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলীসহ সকল ফিক্বহী মাজহাবের আলেমগণ একমত যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করা সুস্পষ্ট কুফর এবং রিদ্দাহ।** তালেবানের কাছে কি এটা অস্পষ্ট? কখনোই না। তাদের কাছেও এটা স্পষ্ট। পাকিস্তানের মত একটি রাষ্ট্র যে তার সেনাবাহিনী দিয়ে বহু মুসলিমদের হত্যা করিয়েছে, অনেক সংখ্যক মুসলিম নারী-পুরুষদের বন্দি করেছে ও আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছে এবং পাকিস্তান সরকারের আদেশে যে সেনাবাহিনী স্বয়ং তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কিভাবে তালেবান আজ সেই পাকিস্তান সরকারের সাথে এতো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলে বিশেষত কিভাবেই বা তালেবান পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর এতো অপরাধ হজম করে তাদেরকে আপন করে নিয়েছে? আমেরিকা কি তুরস্ককে নিয়ে তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি? তুরস্ক তো কিছু দিন আগেও তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এখন কিভাবে তালেবান তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে মুসলিম মহান নেতা ও আলেম বলে সম্বোধন করে? তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকাকে নিরঙ্কুশ সাহায্য করেছিল কাতার। আজ আমরা কাতারের সাথে তালেবানের এক অভূতপূর্ব বন্ধুত্বের বিষয়টি স্পষ্টভাবেই দেখছি। যাদের সহযোগিতা নিয়ে আমেরিকা এতো দিন অনেক মুসলিম মুজাহিদদের হত্যা করেছে বিশেষকরে এই তালেবানের অনেক সদস্য, স্ত্রী, সন্তান ও ভাইদের হত্যা করেছে এবং বন্দি করেছে তালেবান কিভাবে আজ তাদের সাথে এতো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করছে। আমরা এখানে শারীয়াহ'র দিকগুলো নিয়ে আলোচনা বাদই দিলাম। কিন্তু একজন মানুষের এতোটুকু গায়রত তো থাকার কথা যে, যার সহযোগিতা নিয়ে শত্রু এতো দিন আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল কিভাবে আমি আবার তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছি! যে তালেবানকে নিয়ে একসময় আমরা গর্ব করতাম সেই তালেবান আজ এক গায়রতহীন তালেবানে পরিণত হয়েছে! সবচেয়ে

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে শাইখ উসামার হত্যায় সহযোগিতাকারী পাকিস্তানের সরকার ও সেনাবাহিনীর সাথে যখন তালেবান বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে তখন আল-কায়দা কিভাবে এব্যাপারে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে?! তালেবানের সাথে সাথে কি এখন আল -কায়দাও গায়রতহীন হয়ে গেল???



চেতনায় জাতীয়তাবাদঃ

খাম্বা পূজায় লিপ্ত তালেবানঃ

আল্লাহ ﷻ মুসলিম এবং কাফিরের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন। মুসলিম হচ্ছে সম্মানিত আর কাফির হচ্ছে লাঞ্ছিত অপদস্থ। ইসলাম এসেছে জাতীয়তাবাদের মূর্তি ধ্বংস করতে। মুসলিমদের যুদ্ধ-জিহাদ কখনোই কোন জাতীয়তার ভিত্তিতে হয় না আর না জাতীয়তাবাদের সীমানা বা প্রাচীরের ভিত্তিতে হয়। যখন নির্দিষ্ট সীমানা বা প্রাচীরের মধ্যে যুদ্ধ-জিহাদ সীমাবদ্ধ হয়ে যায় তখন সেটা আর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ থাকে না। সেটা হয়ে যায় জাতীয়তাবাদের জন্য যুদ্ধ। আমরা জানি যে, তালেবান বেশ কয়েকবছর ধরেই জোরেশোরে প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছে যে, তাদের যুদ্ধ কেবলমাত্র আফগানিস্তানের মাঝেই সীমাবদ্ধ। আফগানিস্তানের বাহিরে তাদের কোন পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নেই। তাহলে আফগানের বাহিরে জিহাদ ফরজ না? জিহাদের মত আল্লাহর মহান আদেশ কি ব্রিটিশদের অঙ্কিত জাতীয়তাবাদী সীমানার বেড়াজালে আবদ্ধ? নাকি জাতীয়তাবাদী সীমানার বাইরে জিহাদ কার্যকর না!! উইঘুরে মুসলিমরা কি নির্যাতিত না? নাকি ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আজও মুসলিমরা নির্যাতিত!! আফগানিস্তানের বাইরে পুরো পৃথিবীতে কি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে? তাহলে কেন তালেবান জিহাদ শেষ হওয়ার ঘোষণা দিল? মুসলিমদের ভূমিতে আগ্রাসন চালানো সকল কাফিররা কি মুসলিমদের ভূমিগুলো থেকে বের হয়ে গেছে? তাহলে তালেবানের জিহাদ কেন জাতীয়তাবাদী সীমানার ভিতরে সীমাবদ্ধ? মুসলিমদের কোন সমস্যার-ই তো সমাধান হয়নি তাহলে তালেবানের জিহাদ বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার মানেটা কী? জবিহুল্লাহ মুজাহিদ থেকে শুরু করে সুহাইল শাহীনসহ তালেবানের বেশ কিছু কর্মকর্তা ঘোষণা দিয়েছে এবং এখনো দিয়ে যাচ্ছে যে, যেহেতু আফগান স্বাধীন হয়ে গেছে তাই যুদ্ধ-জিহাদ শেষ। কিছু দিন পূর্বেও সুহাইল শাহীনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল–আফগানের বাহিরে মুসলিমদের সমস্যার ক্ষেত্রে আপনাদের করণীয় কী? সুহাইল শাহীনের উত্তর ছিল

এমনঃ*আমরা কিছু আইন তৈরি করছি সেই আইনের মাধ্যমে আমরা সকল সমস্যার সমাধান করব।* গেল কিছুদিন পূর্বে তালেবানের কেন্দ্রীয় মুফতিদের একজন মাওলানা আব্দুর রউফ বলেছে আফগানিস্তানের বাহিরে জিহাদ করা বৈধ নয়। এছাড়াও তালেবানের ঊর্ধ্বতন ও জৈষ্ঠ্য কর্মকর্তাদের বক্তব্য ও লেখনিগুলোতে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আফগানিস্তান (তালেবানের ভাষায়) স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর এখন যুদ্ধ-জিহাদ শেষ হয়ে গিয়েছে। একারণে আফগানিস্তানের ভূমিতে থেকে কেউ পৃথিবীর কোন জায়গায় জিহাদ পরিচালনা করবে–তালেবান এটাও নিষিদ্ধ করে। তালেবান যে একটি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে এর বড় প্রমাণ হল আফগানিস্তানে মুসলিম, রাফিদী, হিন্দু, শিখ, খ্রিষ্টান–সকলে আফগান জাতীয়তার কারণে অধিকারের ক্ষেত্রে সমান। এই ধরনের বিবৃতি তালেবানের নেতাদের বক্তব্যে এবং তালেবানের অফিসিয়ালি সাইটের লেখনিতে প্রমাণিত।

আমরা জানি যে, আফগানিস্তানে ইসলাম ছাড়াও আরো কয়েকটি ধর্মের মানুষ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- হিন্দু, শিখ, খ্রিষ্টান ও রিদ্দায় পতিত রাফিদী। আফগানিস্তানে সকল ধর্মের লোকজন সমান। কারণ তারা আফগান নাগরিক। একজন ব্যক্তি আফগান নাগরিক হলেই সে দেশের সকল অধিকার পাবে এবং সে নিরাপত্তা পাবে। একজন মুসলিম যতটুকু অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা পাবে একজন রাফিদী, শিখ, খ্রিষ্টানও ততটুকুই সম্মান ও নিরাপত্তা পাবে। এর কারণ হল সেই রাফিদী, শিখ বা খ্রিষ্টান আফগান জাতীয়তাবাদী সীমানায় ঘেরা আফগানিস্তানের নাগরিক। তাই তো আমরা দেখি, রাফিদীদের নেতাদের সরকারী বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিতে। আর তালেবানের এই মূলনীতি কুরআন ও সুন্নাহ’র সরাসরি বিপরীত। আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ﴾

“তবে যে মু’মিন সে কি পাপিষ্ঠের সমান? তারা সমান নয়।”[29]

---

[29] সুরা সাজদাঃ ১৮

বর্তমান তালেবান যে, শিরকী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এর সবচেয়ে বড় ও সুস্পষ্ট দলীল হল - তালেবান পূর্বের জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক সরকারের ন্যায় খাম্বা পূজায় লিপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশে ২১ ফেব্রুয়ারিতে যখন শহীদ (!) মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়, স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং ১৬ ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিজয় র‍্যালি বের করা হয়, তখন বাংলাদেশ সরকারের এ কাজ শিরকী জাতীয়তাবাদ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন মুহাক্কীক আলেম-ই প্রশ্ন তোলেনি। আমরা ছোটবেলা থেকে মাসজিদে, ওয়াজ-মাহফিলে, বিভিন্ন ইসলামিক অনুষ্ঠানে ও সাক্ষাৎকারে মুসলিম মুহাক্কীক আলেমদের বয়ানে শুনে আসছি যে, শ্রদ্ধা জানানোর জন্য শহীদ (!) মিনারে ফুল দেয়া, স্মৃতিসৌধে ফুল দেয়া এবং জাতীয়তাবাদী বিজয় দিবস পালন করা—একাজগুলো শিরকী কর্মকাণ্ড। এই ধরনের শিরকী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলিমদেরকে আলেমরা সর্বদাই আহ্বান করে থাকেন। কিন্তু দুঃখ হয় যখন দেখি তালেবান এই শিরকী জাতীয়তাবাদী বিজয় দিবস পালন করছে। কিভাবে তালেবান আফগান জাতীয়তাবাদী দিবস পালন করে? আর কিভাবেই বা তালেবানের সর্বোচ্চ নেতারা আফগান স্বাধীনতা দিবসে বিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়? পাশাপাশি বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সরকারী ছুটি ঘোষণা করে এবং তালেবানের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সকল নেতা ও সৈন্যরা এই জাতীয়তাবাদী দিবস পালন করে? এগুলো কি শুধু আমাদেরই বক্তব্য? না, তালেবান নিজে তাদের এই সকল শিরকী জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ড গর্বভরে প্রকাশ করে। ১৯১৯ সালের ১৯ আগস্ট ব্রিটিশদের কাছ থেকে আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। ব্রিটিশদের থেকে আফগান স্বাধীন করে শাহ আমানউল্লাহ'র মত মুরতাদরা শিরকী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। তালেবান এবার ক্ষমতায় এসে প্রতি বছর এই শিরকী জাতীয়তাবাদী দিবস সরকারীভাবে পালন করছে। সেই বিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভে মোল্লা ইয়াকুব ও মোল্লা আব্দুল গণি বারদারের মত তালেবানের বিভিন্ন মন্ত্রীরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। তাদের এ সমস্ত কর্মের কারণ একটাই তা হল তালেবান ক্ষমতায় আসার পূর্বে আমেরিকাসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারকে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল আজ তালেবান শিরকী জাতীয়তাবাদী উৎসব পালন ও খাম্বা পূজার মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে।

কিন্তু বড় আফসোস হয় তখন যখন দেখি, আল-কায়দাপন্থি কিছু আলেমরা তালেবানের এই শিরকী জাতীয়তাবাদী কর্মকে জায়েয করার চেষ্টা করছে। যারা নিজেরাই এতো দিন বাংলাদেশের মুসলিমদেরকে এই শিরকী জাতীয়তাবাদী উৎসব পালন না করতে এবং শ্রদ্ধা জানানোর জন্য শহীদ (!) মিনারে ও সৃতিসৌধে ফুল দেওয়ার মত শিরকী কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান করত তারাই এখন তালেবানের এই কর্মকে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে জায়েয করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। হে আহমেদ মুখতার, আবু ইমরান আর তামিম আল-আদনানী! বাংলাদেশের শিরকী জাতীয়তাবাদী বিজয়ী দিবস পালন করার মাঝে আর আফগানিস্তানের শিরকী জাতীয়তাবাদী দিবস পালন করার মাঝে কী পার্থক্য রয়েছে? শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বাংলাদেশের সৃতিসৌধে ফুল দেওয়ার মাঝে আর আফগানিস্তানের সৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ফুল দেওয়ার মাঝে কী পার্থক্য রয়েছে? নাকি আপনাদের নেতারা যত অপকর্ম আর শিরক করবে সবগুলোই আপনাদের নিকট জায়েয? আল্লাহর নিকট কী জবাব দেবেন এর জন্য প্রস্তুত হোন!

জাতীয়তাবাদী তালেবান কি মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ?

প্রিয় ভাই আমার! আমি আপনার সামনে প্রথমেই যে বিষয়টা স্পষ্ট করতে চাচ্ছি তা হল, মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ'র পরিচয় কী? আমরা আমাদের রবের কালামে পাক থেকে জানতে পারি যে, যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে আর কাফিররা লড়াই করে তাগুতের পথে। আমরা জানি যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট ঈমান হল, কথা, কাজ ও অন্তরের সত্যায়নের সমষ্টি। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমি বলব, যদি কেউ সালাত আদায় করে, রমাদান মাসে সিয়াম পালন করে, যাকাত প্রদান করে এর সাথে সাথে ঈমান ভঙ্গকারী কোন বিষয় সম্পাদন করে তবে তার উল্লেখিত আমলসমূহ কোন উপকারে আসবে না। কারণ সে ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় সম্পাদন করেছে। যদিও সে জিহাদ করে তথাপি তার আমলনামায় শিরকের উপস্থিতির কারণে তাকে মুজাহিদ ফী

সাবীলিল্লাহ হিসেবে গণ্য করা হবে না। তাহলে চলুন এবার জেনে নেই রাসুলে কারীম ﷺ এব্যাপারে কী বলেছিলেন? যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, "এক ব্যক্তি গনীমতের জন্য লড়াই করে, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য লড়াই করে এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য লড়াই করে। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়াই করল? তিনি ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কলিমা বুলন্দ হওয়ার জন্য লড়াই করে সে-ই আল্লাহর পথে লড়াই করল।"

প্রিয় ভাই! আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই, আচ্ছা বলুন তো রাসুল ﷺ এর বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী দেশাত্মবোধক জাতীয়তাবাদের চেতনায় লড়াইকারী বর্তমান তালেবান কি আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী? উত্তর আপনার জিম্মাহ'তে ছেড়ে দিলাম। ঐ সকল সাহওয়াত–যারা নিজেদের প্রবৃত্তি থেকে তৈরিকৃত বিধান দ্বারা অধিকৃত ভূমি শাসন করে তারা কি আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ? যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করে তারা কি মুজাহিদ? যারা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা رضي الله عنها কে গালি দেয়, আবু বকর, ওমারসহ ব্যাপকভাবে সাহাবীগণকে তাকফীর করে–তাদেরকে যারা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, রাফিদীদের ধৃষ্টতাপূর্ণ শিরকী ইবাদাতে নিরাপত্তা দেয় তারা কি মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ?

অতঃপর আমি বলি, নিশ্চয়ই মুজাহিদগণই ত্বইফাতুল মানসুরার অন্তর্ভুক্ত। কাবার রবের শপথ! মুজাহিদগণই ফিরক্বাতুন নাজিয়াহ'র অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যারা ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহে লিপ্ত তারা মুজাহিদ নয়। যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে ICC ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলার অনুমোদন দেয়, অর্থ যোগান দেয় নিশ্চিতভাবেই তারা রাসুলের নির্দেশনা অনুযায়ী মুজাহিদ নয়।

তালেবানের শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার আসল রূপঃ

মোল্লা ওমার ﵀ ছিলেন মূর্তি সংহারক আর বর্তমান তালেবান হল হাফিজুস সনামঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿۴۱﴾

"তারা এমন যাদেরকে আমরা যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহরই জন্য।"[30] ত্ববারী বলেন, "অর্থাৎ যদি আমরা তাদেরকে বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করি তাহলে তারা মুশরিকদের দমন করে, তাদেরকে পরাজিত করে। তারা সেখানে আল্লাহর আনুগত্য করে ফলে তারা সালাত কায়েম করে, আল্লাহ যাদেরকে যাকাতের হক্বদার বানিয়েছেন তাদেরকে যাকাত প্রদান করে। তারা মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ ও তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার পথে এবং মু'মিনরা যে জ্ঞান রাখেন সেই পথে আহ্বান করে।"

সায়্যিদ কুতুব ﵀ বলেন, "তারা সৎকাজের আদেশ করবে–অর্থাৎ তারা কল্যাণ ও সততার দিকে আহ্বান করবে এবং মানুষকে এর দিকেই চালিত করবে। তারা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে–অর্থাৎ তারা অনিষ্টতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং তারা এ কাজটি বাস্তবায়ন করবে। আর এটাই উম্মাতে মুসলিমার সিফাত, যে মুনকার পরিবর্তন করতে সক্ষম তা অবশিষ্ট রাখে না এবং যে ভালো কাজ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম তা থেকে বসে থাকে না।"[31]

---

[30] সুরা হাজ্জঃ ৪১

[31] ফী যিলালিল কুরআন

অধিকৃত ভূমিতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব–এব্যাপারে কেউ ইখতিলাফ করেনি। শাইখ উসামা বিন লাদিন ﷺ তার শেষ বক্তব্য ও রিসালাগুলোতে এটার উপর জোড় দিয়েছেন। তিনি বলতেন, আমাদের এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা হবে। আর বর্তমান যামানায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার গুরত্ব অপরিসীম। যেহেতু মুসলিমদের প্রায় সবগুলো রাষ্ট্র-ই দারুল কুফরে পরিণত হয়েছে। কারণ এই সকল রাষ্ট্রের উপর চেপে বসে আছে মানবসৃষ্ট আইন দ্বারা শাসনকারী রিদ্দায় পতিত শাসকরা। আর সেই সকল রিদ্দায় পতিত শাসকদেরকে পরাজিত করতে এবং আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'য় নেমে পড়েন সত্যবাদী মুওয়াহহিদ মুজাহিদগণ। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জিহাদ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিপত্তি বাধে তখন, যখন কিছু অঞ্চলে সেই উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে কতিপয় লোক নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শুরু করে। বর্তমান তালেবান এদেরই অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকা হামলা পরবর্তী তালেবান নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিতে তাদের পূর্বের চিত্র নিয়ে ফিরে আসেনি। আমরা দেখছি, তালেবান তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে না। আর তালেবানের পররাষ্ট্রনীতির কথা বলতে গেলে বর্তমান সময়ের আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রনীতি থেকে তালেবানের পররাষ্ট্রনীতি ভিন্ন কিছু নয়। তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসার পূর্বে তাদের অধিকৃত ভূমিগুলোতে শারীয়াহ দ্বারা বিচার-ফায়সালা করত না। তারা বিচারকার্যের জন্য আঞ্চলিক গোত্রীয় আইনগুলোকে বেছে নিয়েছিল। এই চিত্র আমরা তাদের মাধ্যমগুলো থেকেই জেনেছি। তখন কিছু কিছু ব্যক্তি দাবি করত, তালেবান পুরো আফগানিস্তানের ক্ষমতায় যাওয়ার পর পরিপূর্ণ শারীয়াহ দ্বারা দেশ শাসন করবে। যদিও অধিকৃত ভূমিতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করার জন্য কাফিরদের কর্তৃক নির্ধারিত সীমানায় ঘেরা পুরো আফগানিস্তানের দখল নেওয়া শর্ত নয়। শর্ত হচ্ছে, যে ভূমিতে কুদরাহ তথা ক্ষমতা অর্জিত হবে সেই ভূমিতে শারীয়াহ'র বিধিবিধান বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি, তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা নেওয়ার পরেও তারা পরিপূর্ণ শারীয়াহ বাস্তবায়ন করেনি। তারা অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের সরকারের অবকাঠামোর উপর রয়েছে। কোন শহর বা ভূমি বিজয় করার পর সর্বাগ্রে

যে কাজটি করা আবশ্যক তা হল মূর্তি এবং শিরকী চিহ্নসমূহ ধ্বংস করা। আর এ কাজটিই উম্মাহ'র মহান সালাফগণ করতেন।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল حفظه الله বলেন, "মুহাম্মাদ বিন কাসীম আস-সাক্বাফী বর্তমানের করাচী বিজয় করেন এবং সামনে এগোতে থাকেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধ; কোন শহর বিজয় করার পর তিনি প্রথম যে কাজ করতেন তা হল শিরকী মূর্তি ও শিরকী চিহ্নসমূহ ধ্বংস করা, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা এবং মাসজিদ নির্মাণ করা। অবশেষে তিনি রাজা দাহিরের মুখোমুখি হন হিজরী ৯২ বা ৯৩ সনে। তিনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করেন এবং সেই রাজা যুদ্ধে নিহত হয়। হ্যাঁ, মুহাম্মাদ বিন কাসীম আস-সাক্বাফী প্রথম যে কাজটি করেছেন সেই একই কাজ তার পূর্বের বিজয়ীরা করেছেন। ঠিক সেটাই করেছেন আল্লাহর রাসুল ﷺ মক্কা বিজয়ের সময়। তা হল জনসম্মুখে থাকা শিরকের চিহ্নসমূহ অপসারণ করা।"

কিন্তু তালেবান মূর্তি না ভেঙ্গে ঐতিহাসিক নিদর্শনের নামে সেগুলোকে রক্ষা করার ঘোষণা দিয়েছে। আফগানিস্তানের জাদুঘরগুলোর চিত্র পূর্বের মতই রয়েছে। না তালেবান জাদুঘরের ভিতরে থাকা মূর্তি অপসারণ করেছে আর না সেই জাদুঘরগুলোতে পরিদর্শন নিষিদ্ধ করেছে। তাহলে বিজয়ের পর মূর্তি ও শিরকী চিহ্নসমূহ ধ্বংস করার ব্যাপারে শারয়ী বাধ্যবাধকতার বিধান আজ তালেবানের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিতে কোথায় বাস্তবায়িত? মোল্লা ওমার رحمه الله ছিলেন মুহাত্তিমুস-সনাম (মূর্তি ধ্বংসকারী) আর আজকের তালেবান হয়ে গেছে হাফিজুস-সনাম (মূর্তি রক্ষাকারী)। আজেকের তালেবানের লজ্জাও করে না, কিভাবে তারা মিডিয়ার সামনে এসে মূর্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়? এটাই কি অধিকৃত ভূমিতে তালেবানের শারীয়াহ বাস্তবায়ন? তালেবান না কবরের শিরক নিষিদ্ধ করেছে আর না তারা ওয়াহ্দাতুল ওজুদ ও হুলুলিয়্যাহ'র শিরকী আক্বীদাহ'র প্রচার-প্রসার নিষিদ্ধ করেছে। বরং তারা ক্ষমতায় এসেই উঁচু কবর ও মাজার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাহলে আল্লাহর রাসুল ﷺ কর্তৃক আলী رضي الله عنه কে দেওয়া উঁচু কবর সমান করে দেওয়ার সেই নির্দেশ তালেবানের ভূমিতে কোথায় বাস্তবায়িত হল?

আচ্ছা আইসিসি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট যে প্রকাশ্য জুয়ার অন্তর্ভুক্ত–এটা কে না

জানে? বাংলাদেশের কাওমী মাদরাসার বহুসংখ্যক আলেম জুয়ামুক্ত সাধারণ ক্রিকেট খেলাকেও হারাম মনে করেন। আর আইসিসি টুর্নামেন্ট যে জুয়াড়ি টুর্নামেন্ট –এটা কি কোন বিবেকবান লোক অস্বীকার করতে পারবে? এরপরেও তালেবান এই আইসিসি জুয়াড়ি টুর্নামেন্টকে অনুমোদন দিয়েছে। বরং তারা এক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। আফগানিস্তান যখন আইসিসি টুর্নামেন্টের কোন খেলায় জিততে পারে তখন তালেবান এটিকে গর্বভরে নিজেদের বিজয় হিসেবে প্রচার করে। আমরা তো আল-কায়দার আলেমদের এমন লেখনিও পেয়েছি যেখানে তারা আইসিসি এবং ফিফার বিচার ব্যবস্থাকে কুফরি তাগুতী বিচার ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু তালেবান এই অশ্লীলতা প্রসারকারী, জাতীয়তাবাদী ও জুয়াড়ি আইসিসি টুর্নামেন্টকে নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে বৈধতা দিয়ে প্রচার করছে। আর তালেবানের বিচার ব্যবস্থায় শারীয়াহ'র বিধিবিধান বাস্তবায়নের কথা বলতে গেলে–তালেবান এক্ষেত্রে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করেছে। যদিও তালেবান ক্ষমতায় আসার বছর খানেক পর অফিসিয়ালিভাবে স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে, বিচারকার্যে শারীয়াহ'র হদ বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র এর পুরো উল্টো। হাতে গোনা দুই একটি ব্যতীত তালেবানের সকল বিচারালয় এখনো জাহিলী আইন দিয়ে বিচার কাজ পরিচালনা করছে। আমরা দেখেছি, দুইটি প্রদেশ কেবলমাত্র দুই থেকে তিনবার হদ বাস্তবায়ন করেছে। তাও সেটা আবার শারীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত হদ বাস্তবায়ন না করে নিজেদের মনগড়া শাস্তি প্রয়োগ করেছে। শারীয়াহ সমকামিতার হদ নির্ধারণ করেছে মৃত্যুদণ্ড, অথচ তালেবান সমকামীদের ধরে বেত্রাঘাত করে ছেড়ে দিয়েছে। তালেবানের এক কর্মকর্তা যখন যিনার অভিযোগে হাতে নাতে ধরা পড়েছে তখন তার উপর হদ বাস্তবায়ন না করেই তাকে ছেড়ে দিয়েছে। আর বাকি বিচারালয়গুলো চুরির শাস্তি হিসেবে জেল-জরিমানা, চুল কেটে দেওয়াসহ বিভিন্ন শাস্তি দিচ্ছে। মাদক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে একই অবস্থা। আপনি যদি কাবুলের আদালতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন–যেটা তালেবানের রাজধানী, সেখানেও তারা জাহিলী আইন দিয়ে বিচার কাজ পরিচালনা করে।

কেউ কেউ তালেবানের অফিসিয়ালি স্টেটমেন্ট দেখে প্রতারিত হয়ে দাবি করে

যে, তালেবান তো শারীয়াহ অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছে। একটা বিষয় প্রমাণিত যে, সৌদি প্রশাসনের অফিসিয়ালি স্টেটমেন্ট রয়েছে যে, তাদের বিচারালয়গুলোতে শারীয়াহ অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালিত হয়। আর আমরা জানি যে, এই শতকের শুরুর দিকেও সৌদি প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রে হদ বাস্তবায়ন করত কিন্তু সৌদি প্রশাসন হদ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ইহুদীদের হদ বাস্তবায়নের অনুসরণ করত। অথচ আমরা জানি, এই যামানার মুহাক্কীক আলেমগণ সৌদি প্রশাসনের কুফরির মধ্যে এটাও গণ্য করতেন যে, সৌদি প্রশাসন বিচারকার্যে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করে না। সুতরাং এখানে ধর্তব্য বিষয় হচ্ছে কাজে বাস্তবায়ন।

তালেবানের শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা; মুদ্রার অপর পিঠঃ

এখানে একটি বিষয় বলে রাখা উচিৎ যে, কেবলমাত্র কিছু জায়াগায় হুদুদ বাস্তবায়ন করার নাম-ই শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা নয়—যদি না অন্য সবক্ষেত্রে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা হয়। অনেকেই মনে করে থাকেন শুধুমাত্র হদসমূহ বাস্তবায়ন করাই বুঝি শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃতপক্ষে স্বরাষ্ট্রনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতিসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই শারীয়াহ বাস্তবায়ন আবশ্যক। কিন্তু তালেবানের পররাষ্ট্রনীতি পুরোটাই শারীয়াহ বহির্ভূত। আপনি বর্তমানে মুসলিমদের দেশগুলোর কোন একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করে তালেবানের পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করে দেখবেন তেমন কোন পার্থক্য খুঁজে পাবেন না। তাই আপনি দেখবেন, তালেবানের যে নেতাকেই জিজ্ঞাসা করা হয়—আপনারা অমুক রাষ্ট্রের সাথে কেমন আচরণ করতে চান বা অমুক রাষ্ট্রের ব্যাপারে আপনাদের অবস্থান কী? তখন দেখবেন তালেবানের নেতারা নির্দ্বিধায় বলবে, অমুক রাষ্ট্র আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করতে চাই। তালেবান যেকোনো রাষ্ট্রের সাথেই সম্পর্ক করতে চায়—হোক সেটা আসলী কাফির, হারবী কাফির, আল্লাহ ও তার রাসুলকে গালিদাতা এবং মুসলিমদের নির্যাতনকারী রাষ্ট্র অথবা মুরতাদ শাসকদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র তা সমান। আসলী কাফির

রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের কর্মপদ্ধতি কেমন, আর তালেবান কী কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে! মুরতাদ শাসকদের ব্যাপারে ইসলামের বিধিবিধান তো আরো কঠোর। হানাফী মাজহাবের মতানুসারেও তো সাধারণত মুরতাদদের সাথে সন্ধি করা জায়েয নেই। আর যারা সন্ধির ব্যাপারে মত দিয়েছেন তারা এ শর্ত উল্লেখ করেছেন যে, সন্ধি চুক্তির উদ্দেশ্য থাকতে হবে মুরতাদরা যেন তাদের রিদ্দাহ থেকে ফিরে আসে যেমনটি 'বাদা'ইয়ুস সনাঈ'এর লেখক ইমাম কাসানী বলেছেন। যে পাকিস্তান সরকার মুসলিম মা-বোনদেরকে আমেরিকার হাতে তুলে দিত, বহু মুজাহিদগণকে হত্যা করেছে এবং গণতন্ত্র নামক শিরকের দিকে মুসলিমদেরকে ঠেলে দিচ্ছে সেই পাকিস্তান সরকারের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করা কি ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত? মুসলিমদের জাতিগত নিধন চালাচ্ছে যে চীন, সেই চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়া এবং নির্যাতিত উইঘুর মুসলিমদেরকে ঘোষণা দিয়ে বর্জন করা কি ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত? মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকারের চলমান নির্যাতনের মাঝেই তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক দেনদরবার কি ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত? একজন মুসলিমা নারীর নির্যাতনের প্রতিশোধ স্বরূপ তো মু'তাসিম বিল্লাহ কাফিরদের দূর্গ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, হাজ্জাজের মত অত্যাচারী শাসক এক নির্যাতিতা মুসলিমা নারীর আর্তনাদে সাড়া দিয়ে হিন্দুস্থান বিজয়ের জন্য বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তালেবান মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত নির্যাতনকারী কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ছে। যে কাফিররা প্রতিনিয়ত আল্লাহ ও তার রাসুলকে গালি দিচ্ছে, ইসলামকে হেয় করছে এবং মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে হত্যা করছে তালেবান তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি কিভাবে গ্রহণ করে? এই ধরনের কাফির রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করা নিশ্চিতভাবেই কাফিরদের সাথে ওয়ালার অন্তর্ভুক্ত। আপনি চিন্তা করুন, চীন রাশিয়া ও ভারতের মত রাষ্ট্রের সাথে তালেবান দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ইস্যু বৈঠকে যোগদান করে। এরচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে যে, যারা মুসলিমদেরকে চিরতরে নির্মূল করার চেষ্টায় লিপ্ত, যারা আজ অব্দি মুসলিমদের হত্যা করছে ও মা-বোনদের ধর্ষণ করছে এবং যারা সবদিক থেকে মুসলিমদের বেষ্টন করে তাদেরকে ইসলাম থেকে কুফরে পতিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের

সাথে তালেবান নিরাপত্তা ইস্যু বৈঠকে যোগদান করে। এতো কিছুর পরেও কিভাবে বলা হয় যে, তালেবান শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে? তালেবান তাদের অধিকৃত ভূমিতে না সালাত বাধ্যতামূলক করেছে আর না শারয়ী হিজাবের বিধান কার্যকর করেছে। হানাফী মাজহাবের আলেমদের মতানুসারে তো মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখা শারয়ী হিজাবের অন্তর্ভুক্ত নয়।[32] তাহলে তালেবান কোন হানাফী মাজহাবের অনুসরণ করে? আফগানিস্তানের সুদ ভিত্তিক ব্যাংকগুলো তালেবান পুনরায় চালু করে দিয়েছে। তালেবানের রাষ্ট্র পরিচালনায় শারীয়াহ বিরোধী এতো বিষয় থাকার পরেও কিভাবে বলা হয় তালেবান শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে?

শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله বলেছেন, “যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নেই, একশ’র মধ্যে নব্বই পার্সেন্ট হল এমন বিধিবিধান যেগুলোর উৎস হল ইসলামী শারীয়াহ। আর একশ’র মধ্যে দশ পার্সেন্ট হল এমন বিধিবিধান যেগুলোর উৎস হচ্ছে গঠনকৃত আইন তখন ইসলামের মাপকাঠিতে এই সংবিধানকে কুফরি সংবিধান হিসেবে গণ্য করা হবে।”[33] শাইখ رحمه الله একই বক্তব্যে আরো বলেন, “যদি মানুষ ইসলামের সকল বিধান পালন করে কেবল সুদকে হারাম করা ব্যতীত। যেমন তারা সুদী ব্যাংকসমূহের অনুমতি দেয় তাহলে এমন রাষ্ট্রের সংবিধানকে কুফরি সংবিধান হিসেবে গণ্য করা হবে।” শাইখ رحمه الله বলেছেন কেবলমাত্র একটি বিধান পালন করা থেকে বিরত থাকলে অথবা কোন একটি হারাম বিষয়ের অনুমতি দিলে সেটাও কুফর হবে।

আমরা জানি, আবু বকর رضي الله عنه কেবলমাত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি

---

[32] হানাফী মাজহাবের আলেম মুহাম্মদ শফী উসমানী বলেছেন, “ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল–তিনজনই মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি খোলা রাখার মোটেই অনুমতি দেননি- তা ফিতনার আশংকা থাকুক বা না থাকুক। ইমাম আবু হানীফা ফিতনার আশংকা যদি না থাকে এই শর্তে খোলা রাখার কথা বলেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এই শর্ত পূরণ হবার নয়, তাই হানাফী ফকীহগণ গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি খোলা রাখার অনুমতি দেননি।” [মা‘আরিফুল কুরআনঃ৭/২১৪]

[33] আর-রিসালাতুর রবীআহ ইলা আহলিল ইরাকী খাসসাহ ওয়াল-মুসলিমীনা আম্মাহ

জ্ঞাপনকারীদের রিদ্দাহ’র হুকুম দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আর সকল সাহাবীগণের ইজমা ছিল যে, এই যুদ্ধ ছিল রিদ্দাহ’র যুদ্ধ। এটাই ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র প্রকৃত অবস্থা। কোন দল বা জামাআত যদি শারয়ী ওয়াজিব বিষয়সমূহের কোন একটি বিষয় পালনে বিরত থাকে যে অবস্থায় তাদের ক্ষমতা ও শক্তি রয়েছে তখন সেই দল বা জামাআতকে ত্বইফাতুল মুমতানিআহ হিসেবে গণ্য করা হয়। আর তালেবান এরকম অনেক শারয়ী বিষয় পালন করা থেকে বিরত রয়েছে। তালেবান সর্বস্বীকৃত এক জুয়াকে অনুমোদন দিচ্ছে ও তাতে অর্থায়ন করছে, সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অনুমতি দিচ্ছে, শারয়ী হদ বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকছে, ভবিষ্যতে জিহাদ না করার ঘোষণা দিয়েছে, নির্যাতিত মুসলিমদের বর্জন করে হারবী কাফিরদের সাথে মিত্রতা করছে, মুশরিক রাফিদীদের শিরকী উৎসবে পাহারা দিচ্ছে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে মূর্তি রক্ষা করছে এবং যারা পরিপূর্ণ শারীয়াহ বাস্তবায়ন করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের হত্যা করছে। এছাড়াও শারয়ী অনেক বিষয় থেকে তালেবান নিবৃত্ত রয়েছে। আর আমরা জানি যে, ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র হুকুম হচ্ছে রিদ্দাহ এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব শাইখুল ইসলামের ক্বওল নক্বল করার পর বলেন, “আপনি তার উক্তি ও বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন, কারণ ইমামের নিকট যাকাত আদায়ে নিবৃত্ত দলটির সাথে যুদ্ধ করা হয় এবং তাদেরকে কুফরের ও ইসলাম থেকে রিদ্দাহ’র হুকুম দেওয়া হয়, তাদের সন্তান-সন্ততিদের বন্দি করা হয় এবং তাদের সম্পদ গণিমাহ হিসেবে নেওয়া হয়। যদিও তারা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার স্বীকৃতি দিত, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করত এবং যাকাত আদায় ব্যতীত ইসলামের সকল শারয়ী বিষয়সমূহ পালন করত। এগুলো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদেরকে কুফর রিদ্দাহ’র হুকুম দেওয়াকে বাতিল করতে পারেনি। আর এব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের رضي الله عنهم ঐক্যমত প্রমাণিত হয়েছে। ওয়াল্লাহু আ’লাম।”[34] তালেবান এরকম কত শারয়ী বিধান পালন করা থেকে বিরত রয়েছে!

[34] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহঃ ১০/১৭৯

সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অনুমোদন দেয় অনৈসলামিক ইমারাতঃ

আল্লাহ ﷻ সুদ হারাম করেছেন। কিন্তু কুফফার জাতি-গোষ্ঠী মুসলিমদেরকে এই সুদ ভিত্তিক লেনদেনের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য সুদী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। দুনিয়ালোভী কতিপয় ব্যক্তি কাফিরদের বাতলে দেওয়া পদ্ধতি গ্রহণ করে সুদ ভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। আর কুফফার জাতি-গোষ্ঠীর অভিপ্রায় রক্ষা ও নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে গিয়ে মুসলিম নামধারী তাগুত শাসকরা সেই সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অনুমোদন দিয়ে দেয়। ইসলামের সুস্পষ্ট একটি হারাম বিধানকে মানুষের জন্য বৈধ করে দেয়। এভাবেই তারা আল্লাহ প্রদত্ত হারাম বিষয়কে বৈধ হিসেবে অনুমোদন দেওয়ার মাধ্যমে হালালে রূপান্তরিত করে। এর থেকে বাদ যায়নি অনৈসলামিক ইমারাতের মুরতাদ তালেবান সরকার। আমেরিকার সৈন্য প্রত্যাহার পরবর্তী আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসা তালেবান ঠিক তার পূর্বের গণতান্ত্রিক সরকারের মতোই সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করে দিয়েছে। আফগানিস্তানের প্রতিটি ব্যাংক সুদ ভিত্তিক লেনদেন করে যাচ্ছে। কোন রাগঢাক ছাড়াই ব্যাংকগুলো প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে মুসলিমদেরকে সুদী লেনদেন করার প্রতি আহ্বান করছে। আফগানিস্তানের ইসলামী ব্যাংক, ইউনাইটেড ব্যাংক, পশতুনী ব্যাংক, আযীযী ব্যাংক, গাযানফার ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকগুলো সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনা করছে! আমরা এখানে কয়েকটি ব্যাংকের অফিসিয়ালি ওয়েবসাইট থেকে সম্প্রতি দেওয়া বিবৃতি তুলে ধরছি।

আফগানিস্তানের আযীযী ব্যাংকের অফিসিয়ালি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত:

Fixed Deposit

Looking for a safe and secure FIXED DEPOSIT?

Now get higher interest rate for fixed deposits of tenure 3 months up to 5 years Rate of Interest up to AFN 4.50% & USD up to 3.50%

Benefits of Fixed Deposite:

Safe mode of invesment

Offers fixed & stable returns

Credit card against FD

Loan against FD

Premature withdrawals are allowed

Walk into any of our 77 branches to open your FIXED DEPOSITE. To know more

* Minimum amount is not less than AFN 10000 / USD 300[35]

আযীযী ব্যাংকের আরেকটি বিবৃতি-

Earn competitively higher interest on your savings with flexibility, security and excellent returns with Azizi Bank Fixed Deposit Account. Save money for yours & family's future requirements.

Is a form of deposit that Bank provide a higher interest rate of interest than a regular Savings Account, until the given maturity date

Fixed Deposit Account can be opened in AFN and USD only

Minimum period for Fixed Deposit is 3 months or 90 days

Maximum period for Fixed Deposit is 5 years or 60 months

Minimum amount is not less than AFN 10000 / USD 300

Individuals/ Firms/ Corporate / NGOs can open Fixed Deposit.

Azizi Bank offers two variants of Fixed Deposit Accounts for customer flexibility.[36]

আফগানিস্তানের পশতুনী ব্যাংকের অফিসিয়ালি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত:

Pashtany has the right savings account tailored with the needs of its customers and market. Saving funds with Pashtany Bank will give its customers easy access to their funds in all parts of the country any time. Pashtany Bank account is always at your fingertips with mobile, online banking and other innovative services of Pashtany Bank. With the wide network of Pashtany Bank ATM facility accessing cash will always be easier and safer.

---

35 https://www.azizibank.af/Pages/Content/27/Fixed%20Deposit

36 আযীযি ব্যাংকের অফিসিয়ালি ওয়েবসাইট লিঙ্ক- https://azizibank.af/#pills-contact

Eligibility:

1-Pashtany Bank Saving Account facility is for individuals.

2-Account can be opened in both Afghani and US dollar

3-Joint Account facility is available.

4-Payment of interest at competitive rates in the market.[37]

আফগানিস্তানের গাযানফার ব্যাংকের অফিসিয়ালি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত:

Islamic Banking Window of Ghazanfar Bank, provides great opportunity for its customers to earn Halal profit on their saving while having the flexibility to withdraw funds when required, via having Mudarabah Saving account.The Structure is based on the principle of Mudarabah which is strictly in conformity with the rules of Islamic Sharia'h.Under this relationship, the customer is an investor (Rab-ul-Maal) and the bank is Manager (Mudarib) of the deposited fund.Profit Sharing Rule No fixed profit will be committed before or at the time of opening an Account.Eared profit will be divided between bank and customer based on agreed ratio Profit (if any) will be on the minimum balance after Banks quarter.Declared Profit Latest rate announced for Mudarabah saving: 0.57% (For The Month) Eligible Customer Adult individuals, singly or jointly with other adults.Requirement Address proof by taking taskara.Identification proof like passport, voter identity card, identity cards issued by employer.. Latest photograph.Schedule of charges On the closure of account before three months USD $10 will be charged and it will go to the charity Waqf fund account.Cheque book of 25 Leaves shall be issue free for the first time and subsequent issue shall be charged at USD 10. Profit amount will be transferred to the customers accounts after tax deduction.Minimum Amount The minimum initial deposit should be USD 100 or equivalent Minimum account balance to be maintained is AFN 1000 or USD 20 The account holder will be provided unique user ID and secured password to view his account through our internet facility at a later date to becommunicated to him/her.The customer can take print of account statement by using the facility.Maximum Amount LNo Maximum limit.Benefits Free cheque book for the first time Monthly statement

[37] https://pashtanybank.com.af/saving-accounts পশতুনী ব্যাংকের অফিসিয়ালি ওয়েবসাইট লিঙ্ক- https://pashtanybank.com.af

Incompliance with Sharial rules and principles Internet banking.[38],[39]

তালেবান এবার ক্ষমতায় ফিরে আসার পর এই সমস্ত সুদী ব্যাংকের অনুমোদন বহাল রেখেছে! তালেবানের পক্ষ থেকে এই ব্যাংকগুলোর বৈধতা দেওয়াটা সুস্পষ্ট কুফর। শাইখ উসামা বিন লাদিন ﷫ বলেছেন, "সুতরাং যদি মানুষ ইসলামের সকল আহকাম পালন করে সুদকে হারাম করা ব্যতীত, যেমন- তারা সুদী ব্যাংকসমূহের বৈধতা দেয়। সুতরাং এমন রাষ্ট্রের সংবিধানকে কুফরি সংবিধান হিসেবে গণ্য করা হবে। কেননা এই কাজ শারীয়াহ এবং শারীয়াহ অবতীর্ণকারীর পরিপূর্ণ না হওয়ার বিশ্বাসকে শামিল করে। এবং এটা যে একটা বড় কুফর তা গোপন নয় –যা মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়।"[40]

---

38 https://www.ghazanfarbank.com/mudarabah_saving গাযানফার ব্যাংকের অফিসিয়ালি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক: https://www.ghazanfarbank.com

39 কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অন্যান্য ব্যাংকের বিবৃতি উল্লেখ করা হয়নি। সত্যানুরাগী ব্যক্তি ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে পারেন!

40 আর-রিসালাতুর রবীআহ ইলা আহলিল ইরাকী খাসসাহ ওয়াল-মুসলিমীনা আম্মাহ।

তালেবান পরাজিত হয়েছেঃ

প্রত্যেক বিষয়কেই তার বিপরীত দিক থেকে চেনা যায়। তাই আমরা তালেবানের পরাজিত হওয়ার ব্যাপারটি খোলাসা করার জন্য ওহীয়ে রাব্বানীর আলোকে বিজয় কাকে বলে তা বোঝার চেষ্টা করব ইনশা'আল্লাহ। আমরা জানি যে, পূর্বেকার যামানায় একদল লোক যারা ঈমান এনেছিলেন, যাদের সবাইকে একত্রে হত্যা করা হয়। এমনকি ঐ মু'মিনদের একজনও বাকি ছিল না, যে তাদের পরবর্তীতে অন্য কাউকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে ডাকবে, তাওহীদের দিকে ডাকবে। এমন কিছু লোকের কর্মের ব্যাপারে আমাদের দয়াময় রব বলেন,

﴿ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ﴾

"এটা বিরাট সফলতা।"[41]

কুরআনে যে ঘটনা আসহাবুল উখদুদের ঘটনা নামে উল্লেখ আছে। আসহাবুল উখদুদের ব্যক্তিগণের শুধুমাত্র ঈমান আনা এবং ঈমানের উপর অটল অবিচল থেকে মৃত্যুবরণ করতে পারাকেই আল্লাহ সুবহানাহু বিরাট সফলতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেন আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি এবং বিশুদ্ধ আক্বীদাহ ধারণকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারার মহান মর্যাদা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারি। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, তাওহীদের উপর অটল অবিচল থেকে মৃত্যুবরণ করাকে বিরাট সফলতা বা বিজয় বলা হয়। বিপরীতে তাওহীদ এবং বিশুদ্ধ আক্বীদাহ'র পথ থেকে পদস্খলিত হওয়াকেই পরাজয় বলে। এমনটিই বলেছেন আমাদের পূর্বসূরী শাইখুল মুজাহিদ ইউসুফ আল-উআইরী رحمه الله তার কিতাব "**ثوابت على درب الجهاد**" এ। তিনি পরাজয়ের ৮টি ধরন উল্লেখ করেছেন। তা হল-

১। কুফফারদের পথ অনুসরণ করা।

২। কাফিরদের প্রাধান্য মেনে নেওয়া।

---

41 সুরা বুরূজঃ ১১

৩। কুফফারদের প্রতি ঝুঁকে পড়া।

৪। কুফফারদের আনুগত্য করা।

৫। হতাশ হয়ে পড়া।

৬। জিহাদের পতাকা ছেড়ে দেওয়া।

৭। সামরিক বিজয়ের আশা ছেড়ে দেওয়া।

৮। শত্রুকে ভয় পাওয়া।[42]

তালেবান পরাজিত হয়েছে। কারণ যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার আদর্শ পরিবর্তন করে তাহলে সেটাই হল তার পরাজয়। আর তালেবান বদলে গেছে, এর জ্বলন্ত প্রমাণ হল- মোল্লা ওমার রহিমাহুল্লাহ এর নেতৃত্বাধীন তালেবান ছিল মূর্তি ধ্বংসকারী। আর বদলে যাওয়া তালেবান হল মূর্তি প্রতিরক্ষাকারী। মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার রহিমাহুল্লাহ এর তালেবানের কাছে একজন মুসলিমের মূল্য একটি ইসলামী ইমারাতের চাইতেও বেশি ছিল। এজন্যই তারা শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ কে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়নি। আর বর্তমান তালেবান মূলত ক্ষমতায় এসেছে জিহাদের দাবিদার কোন দল যেমন- আল-কায়দা এবং দাওলাহ'কে আফগানিস্তানের ভূমি ব্যবহার করতে দেবে না ও এদেরকে পরিপূর্ণরূপে নিধন করবে এই শর্ত মেনে নিয়ে। যেহেতু তালেবান বদলে গেছে এবং তালেবানের আদর্শ পরিবর্তন হয়েছে তাই তালেবানই পরাজিত হয়েছে। ইউ.এস রিপোর্ট এবং ওয়ার্ল্ড রিপোর্টের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইউ.এস গভর্নমেন্ট মুসলিম বিশ্বের হৃদয় ও মন জয় করতে কতখানি তৎপর যা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের একটি অখণ্ড অংশ। বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধের এই অদৃশ্য অংশ যুদ্ধক্ষেত্রের মত একই রকমভাবে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ অথবা তার চেয়ে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ? এটা প্রকাশ করে আমেরিকার সরকার মুসলিম মৌলবাদীদের সাথে একই সাথে বসতে ও কাজ করতে আগ্রহী, যদি তারা দু'টি বিষয় মেনে নেয়ঃ গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী চলতে রাজি হয় এবং সন্ত্রাসবিরোধী

---

[42] বিস্তারিত "ثوابت على درب الجهاد" কিতাব থেকে দেখে নিতে পারেন।

অভিযানে তাদের একটি অংশ হিসেবে কাজ করে। আমেরিকা সবসময়ই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চলমান জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ নাম দিয়ে এর বিরুদ্ধে সবাইকে তাদের সাথে কাজ করতে বলে থাকে। অনেক মুসলিম এবং নামধারী ইসলামিক সংগঠন আছে যেমন- তালেবান–যারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তারা আমেরিকার সরকারের সাথে কাজ করার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছে। তাদের পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি হল তারা (কথিত) ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠার জন্য এমন করছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো সাধারণ উক্তি ছাড়া কিছুই না যা যেকোনো উপলক্ষে ব্যবহার করা যায়, এমনকি যদি তা ইসলামের নামেও হয়। তথাপি তালেবান কুফফারদের তরফ থেকে কী অর্জন করেছে তা কোন বিষয়ই না। তা নিতান্তই মূল্যহীন। আল্লাহর এমন মানুষের প্রয়োজন নেই যারা নিজ দ্বীন নিয়ে কুফফারদের সাথে আপোষ করে ক্ষমতা এবং সম্মান লাভ করার জন্য।

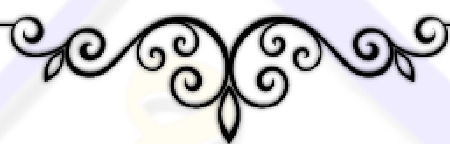
প্রিয় পাঠক! আমেরিকা ২০০১ সালে কেন আফগানিস্তানে হামলা চালিয়েছিল? কারণ কি এটা ছিল না যে, শাইখ উসামা رحمه الله কে আমেরিকার কাছে তুলে দিতে মোল্লা ওমার رحمه الله এর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা? তখন আমেরিকার চাহিদা ছিল আফগানিস্তান যেন তাদের ভাষায় সন্ত্রাসীদের[43] ঘাটিতে পরিণত না হয় এবং শাইখ উসামা বিন লাদেন رحمه الله কে যেন ওদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার رحمه الله কি ওদের দাবি পূরণ করেছিলেন? তিনি ছিলেন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি। যে দাবি মানতে বাধ্য করার জন্য আমেরিকা ও তার ন্যাটোজোট আজ থেকে ২২ বছর আগে আফগানিস্তানে আক্রমণ চালিয়েছিল সেই দাবিই বর্তমান তালেবান মেনে নিয়েছে। শুধু লাঞ্ছনাদায়ক ও অপমানমূলক এই শর্ত মেনেই নেয়নি বরং তারা তা কাজে বাস্তবায়ন করে আমেরিকা ও এর মিত্রদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছে। মোদ্দাকথা যে দাবি না মানার কারণে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, ২০ বছর পর তা মেনে নেওয়া কি পরাজয় নয়? জি হ্যাঁ! এটাই প্রকৃতার্থে সুস্পষ্ট পরাজয়। যতই মোহনীয় কণ্ঠে একে ফাতহে মুবীন বলে প্রচার চালিয়ে এই সুস্পষ্ট পরাজয়কে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করুক না কেন আসলে তা ঢেকে রাখা সম্ভব নয়।

[43] সন্ত্রাসীদের অর্থাৎ হক্বপন্থী মুজাহিদদের।

কাফিরদের প্রাধান্য মেনে নেওয়া কি পরাজয় নয়? অবশ্যই কাফিরদের প্রাধান্য মেনে নেওয়া মানে পরাজিত হওয়া। তাই তালেবান পরাজিত হয়েছে। কারণ তালেবান জাতিসংঘ নামক কুফরি সংঘের সদস্য হতে চেয়েছে। আর এটা কাফিরদের প্রাধান্য মেনে নেওয়ার নামান্তর।

জিহাদ ছেড়ে দেওয়া কি পরাজয় নয়? নিশ্চিতভাবেই জিহাদ পরিত্যাগ করা মানে পরাজিত হওয়া। শত্রুরা আমাদের কাছে কী চায়? তারা চায় আমরা যেন ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দেই। তাই নয় কি? কাফিররা চায় আমরা যেন ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করি আর আমরাও ওদের চাওয়া মত কাজ করলাম। তাহলে এটাই তো পরাজয়। আর আমরা জেনেছি যে, তালেবানের এক মুফতী ফাতাওয়া দিয়েছে - আফগানিস্তানের বাইরে জিহাদ করা বৈধ নয়। তাহলে তালেবানের ফাতাওয়া অনুযায়ী আফগানিস্তানের বাইরে কোন জিহাদ নেই। আর তাদের নেতা জবিহুল্লাহ মুজাহিদ কাবুল দখলের পরই ঘোষণা করেছিল, আমাদের যুদ্ধ শেষ। অথচ রাসুল ﷺ বলেছেন, “আমার উম্মাতের একদল লোক হক্বের উপর দৃঢ় থেকে বিজয়ীরূপে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে।” যুদ্ধ ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। অপরদিকে তালেবানের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যেহেতু তালেবান যুদ্ধ ছেড়ে দিয়েছে তাই তারা পরাজিত হয়েছে। তালেবান পরাজিত হয়েছে, কারণ শাইখুল মুজাহিদ ইউসুফ আল-উআইরী رحمه الله বলেছেন সামরিক বিজয়ের আশা ছেড়ে দেওয়াটাও এক ধরনের পরাজয়। তালেবান ক্বিতালের মাধ্যমে বিজয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা, আলোচনা, সমঝোতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং এর মাধ্যমেই সমাধান খুঁজছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় আফগানের শিরকী জাতীয়তাবাদী ১০৪ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেওয়া মৌলভী আব্দুল কাবীরের (উপ প্রধানমন্ত্রী) বক্তব্যে। সুতরাং তালেবান পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং পরাজিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ



আল-কায়দা প্রসঙ্গঃ

পটভূমিঃ

শাইখ উসামা رحمه الله এর নেতৃত্বাধীন তানযীম আল-কায়দা। একটি আবেগের নাম, একটি অনুভূতি ও মুসলিম উম্মাহ'র গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের নাম। সৈর্য-বীর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা আর কুরবানির উপাখ্যানে ভরপুর ছিল শাইখ উসামার নেতৃত্বাধীন তানযীম আল-কায়দা। তানযীম আল-কায়দার প্রতিষ্ঠাতা এবং আমীর শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله ছিলেন বিংশ শতাব্দীতে শাইখুল মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব رحمه الله এর আদর্শের সত্যিকারের ধারক-বাহক। পৃথিবীর বুকে অনেকগুলো ময়দানে জিহাদ বিস্তৃত হওয়ার ক্ষেত্রে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন শাইখ উসামা رحمه الله- তার জীবদ্দশায় সুউচ্চ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলছিল তানযীম আল-কায়দা। টুইনটাওয়ারে হামলা এবং পরবর্তীতে আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালানোর ২ বছর পার না হতেই ইরাকে হামলা চালায় ক্রুসেডার আমেরিকা ও তার জোট। ক্রুশের দম্ভ চূর্ণকারী উম্মাহ'র মহান বীর শাইখ আবু মুসআব আয-যারকাওয়ীর নেতৃত্বে ইসলামের একদল সিংহ শার্দূলেরা ইরাকে আমেরিকার কবর রচনা করতে থাকেন—আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে।

২০০৪ সালে আবু মুসআব আয-যারকাওয়ী رحمه الله তার প্রতিষ্ঠিত দল জামাআতুত তাওহীদ ওয়াল-জিহাদসহ আল-কায়দার আমীর শাইখ উসামাকে বাইআত প্রদান করেন। দিনকে দিন আমেরিকার বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। মুজাহিদগণ ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে ইরাকে মাজলিসে শুরাল মুজাহিদীন গঠন করতে সক্ষম হন—বি-ইযনিল্লাহ। এরপর উম্মাহ'র মহান বীর আবু মুসআব আমেরিকার বিমান হামলায় শাহাদাত বরণ করেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই হিলফুল মুতায়্যিবীন গঠন হয়। আবু মুসআব আয-যারকাওয়ীর পর দুই নদীর দেশে আল-কায়দার আমীর হন শাইখ আবু হামজা আল-মুহাজির। রমাদান ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২০০৬ সালের অক্টোবরে দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ গঠন করে ইরাকের মুজাহিদ দলগুলো। জাইশু আহিলস সুন্নাহ এবং আল-কায়দাসহ অন্যান্য সংগঠনগুলো দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র সাথে একীভূত হয়ে যায় ও নিজেদেরকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে। এব্যাপারে আল-কায়দার

তখনকার আমীর শাইখ আবু হামজা আল-মুহাজির ﷺ বলেন, "যেহেতু এখন সত্যবাদিতা ও চূড়ান্ত ফয়সালার সময় হয়েছে। তাই আমি সম্মানিত শাইখ ও অগ্রগামী বীরকে উদ্দেশ্য করে বলছি, যিনি কুরাইশী, হাশিমী ও নসবের দিক থেকে হুসাইনী, আমীরুল মু'মিনীন আবু ওমার আল বাগদাদী, আমি আপনাকে বাইআত দিচ্ছি। আমি শপথ করছি যে, আপনার কথা শুনবো ও মানবো, সন্তুষ্টিতে ও অসন্তুষ্টিতে, সুখে ও দুখে এবং নিঃস্বার্থভাবে। আমি শপথ করছি নেতাদের সাথে বিবাদ না করার। আমি শপথ করছি যে, আমি যেখানেই থাকি না কেন সত্য বলবো এক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করব না। আমরা মাজলিসু শুরাল মুজাহিদীনসহ যা কিছু গঠন করেছিলাম সবকিছু মাজলিসের ভাইদের পক্ষ থেকে দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামিয়্যাহ'র সাথে মিশে যাওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি। আপনার সরাসরি নেতৃত্ব ও হস্তক্ষেপের অধীনে পেশ করছি ১২ হাজার যোদ্ধা যারা আল-কায়েদার সৈন্য, যারা প্রত্যেকেই আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুর ব্যাপারে বাইআত গ্রহণ করেছে। এবং আরো ১০ হাজারের বেশি লোককে, যাদের দৈহিক প্রস্তুতি এখনো সম্পন্ন হয়নি। ওই সত্তার কসম, যিনি খুঁটি ছাড়াই আসমানকে উঁচু করেছেন, আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমূদ্রেও ঝাপিয়ে পড়েন, তবে আমরা সবাই আপনার সাথে সমূদ্রে ঝাপিয়ে পড়বো। আমাদের একজন লোকও তা থেকে পিছিয়ে থাকবে না। সুতরাং আজ থেকে আমরা আপনার আত্মমর্যাদাশীল সৈনিক ও নিষ্ঠাবান লোক।"

দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতার সাথে দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। এক পর্যায়ে ২০১১ সালে আমেরিকা পরাজিত হয়ে ইরাক ছাড়তে বাধ্য হয়। ২০১১ সালে শামে মুসলিমদের উপর নির্যাতনের মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলে দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র দ্বিতীয় আমীর আবু বকর আল-বাগদাদী আল-কুরাইশী ﷺ নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্যার্থে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর নাম দেন জাবহাতুন নুসরাহ এবং এর আমীর হিসেবে নির্ধারণ করেন তার অনুগত সৈনিক আবু মুহাম্মাদ আল-জুলানীকে। আর খুব স্বাভাবিকভাবেই জাবহাতুন নুসরাহ দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র একটি অংশ হওয়ার কারণে তা দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র আক্বীদাহ-

মানহাজের ধারক-বাহক ছিল। শামের অনেকেই জাবহাতে যোগদান করে এবং আক্বীদাহ-মানহাজের বিশুদ্ধতার কারণে মুহাজিরদের উল্লেখযোগ্য অংশ জাবহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। দাওলাতুল ইরাকের বাইতুল মালের অর্ধেক সম্পদ জুলানীর নেতৃত্বে থাকা জাবহাতুন নুসরাহ'র জন্য প্রেরণ করা হত। আল্লাহর অনুগ্রহে জাবহাতুন নুসরাহ শামের বিস্তৃত অঞ্চল বিজয় করতে সক্ষম হয়। জাবহাতুন নুসরাহ নুসাইরী রাফিদীদের বর্বর নির্যাতনের কবল থেকে মুসলিমদের রক্ষা করতে অপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। শামে বিজয়াভিযান অব্যাহত থাকে কিন্তু দাওলাতুল ইসলামের আক্বীদাহ-মানহাজ অনুযায়ী শামে বিজয়সমূহের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। আবু বকর আল-বাগদাদী ﷾ এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, আবু মুহাম্মাদ জুলানী এবং তার আশেপাশের লোকজন দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আবু মুহাম্মাদ জুলানী শিরক, রিদ্দাহ'র দলগুলোকে এবং তাদের মন্দ পরিচালনা কমিটি ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীর শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য জোড় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। সারির অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্রকারী ও খিয়ানতকারী একদলের পক্ষ থেকে কার্যত বিজয় নষ্টকরণ ও ছিনিয়ে নেওয়ার হুমকি আসছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আবু বকর আল-বাগদাদী ﷾ তার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে মূল বাস্তবতা উন্মোচন এবং বিষয়গুলো সংশোধন করতে চাইলেন। তাই শাইখ বাগদাদী ﷾ শাইখুল মুজাহিদ আবু আলী আল-আনবারী ﷾ কে শামে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন।

শাইখ আবু আলী আল-আনবারী ﷾ পুরো শাম জুড়েই সফর করেন। তিনি শামের প্রতিটি অঞ্চলেই যান। সেখানে তিনি জাবহাতুন নুসরাহ'র নেতৃবৃন্দ এবং সৈনিকদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেন এবং সংশোধনের চেষ্টা করতে থাকেন। পরবর্তীতে তিনি জুলানীর সাথে থেকে যান এবং তাকেও সংশোধনের চেষ্টা করে যান। কারাগারে এক সাথে থাকার কারণে শাইখ আবু আলী আল-আনবারী আবু মুহাম্মাদ জুলানীকে আগে থেকেই চিনতেন। সেখানে থাকা অবস্থাতেই শাইখ আবু আলী আল-আনবারী ﷾ আবু বকর আল-বাগদাদী ﷾ কে চিঠি লিখে আবু মুহাম্মাদ জুলানীর ব্যাপারে অবহিত করেন। তিনি চিঠিতে লিখেনঃ "একজন প্রতারক

দ্বিমুখী লোক, যে নিজেকেই পছন্দ করে এবং নিজের সৈনিকদের দ্বীনদারিত্বের ব্যাপারে কোন পরোয়া করে না। সে তার সৈনিকদের রক্ত বিসর্জন দিতে উদ্যত হয় যেন মিডিয়াতে তার আলোচনা নিশ্চিত হয়। আর যখন মিডিয়াতে তার নাম আলোচিত হয় তখন সে শিশুদের মত খুশিতে উড়তে থাকে।”[44]

শামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে জুলানীঃ

দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র বিচক্ষণ নেতৃবর্গের নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আবু মুহাম্মাদ জুলানী প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে, এমনকি বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ করার জন্য উপযুক্ত সময় খুঁজছে। তখনই দাওলাহ'র নেতৃবর্গ ঠিক করেন, তারা দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যেন জুলানীকে সরিয়ে জাবহাতুন নুসরাহ'র জন্য নতুন নেতৃত্ব নির্ধারণ করা যায়। যেহেতু জুলানী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। তাই দাওলাহ'র নেতৃত্ব অনুভব করল, যদি তারা জুলানীকে সরিয়ে অন্য নতুন কোন নেতৃত্ব নির্ধারণ করে তাহলে বিষয়টি ব্যাপক মাসলাহার পরিপন্থি হবে। আর একারণেই শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ﵀ তড়িৎ গতিতে জাবহাতুন নুসরাহ'র নাম বিলুপ্ত করে দেন এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন যে, জাবহাতুন নুসরাহ দাওলাতুল ইসলামের অনুগামী একটি শাখা। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শাইখ বাগদাদী ﵀ কে শাইখ আবু আলী আল-আনবারী ﵀ সাহায্য করেন। আমীরুল মু'মিনীন শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী﵀ ইরাক এবং শামের মুজাহিদগণ ও আহলুস সুন্নাহ'কে উদ্দেশ্যে করে একটি বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাতে বলেন, “জাবহাতুন নুসরাহ দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র সম্প্রসারণ এবং এরই একটি অংশ। আর আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তেখারা করার পর এবং আমরা যাদেরকে দ্বীনের ও প্রজ্ঞার ব্যাপারে বিশ্বস্ত মনে করি তাদের সাথে পরামর্শ করার পর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছি যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি সবকিছুর ঊর্ধ্বে–এর কারণে

[44] লুমহাতুন মিনান-নাশআতি ইলাত-তামাদ্দুদ

আমাদেরকে যা গ্রাস করার করুক। তাই আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে ‘দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ’ নাম বাতিল করার ও ‘জাবহাতুন নুসরাহ’ নাম বাতিল করার ঘোষণা দিচ্ছি এবং আমরা আরো ঘোষণা দিচ্ছি, এ দু’টিকে একই নামে অন্তর্ভুক্ত করার, তা হল দাওলাতুল ইসলামীয়্যাহ ফীল ইরাক ওয়াশ শাম।”

যখন আবু মুহাম্মাদ জুলানী এই বিষয়টি জানতে পারল তখন তড়িৎ গতিতে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করল। আর সে দাবি করল যে, তার জানামতে কারো সাথেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পরামর্শ করা হয়নি। তাই সে দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ’র বাইআত ভঙ্গ করল এবং ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরীকে বাইআত প্রদানের ঘোষণা দিল। এর মাধ্যমে জুলানীই শামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল। প্রিয় ভাই! আপনি অবশ্যই খেয়াল করেছেন যে, আবু মুহাম্মাদ জুলানী দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ’র আমীর শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী حفظه الله এর অধীনস্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রতারণামূলকভাবে ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরীকে বাইআত প্রদানের ঘোষণা দেয় এবং এর মাধ্যমেই প্রথম মু’মিনদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। উম্মাহ’র সামনে জুলানীর পদস্খলনের একটি ধাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মু’মিনদের মাঝে বিভক্তি তৈরির জন্য যাওয়াহিরীই দায়ীঃ

মু’মিনদের মাঝে বিভক্তি তৈরি করে জুলানী আর এই বিভক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী। হ্যাঁ, তিনি-ই মু’মিনদের মধ্যে এই বিভক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরীকে দাওলাতুল ইসলামের পক্ষ থেকে জুলানীর বাইআত গ্রহণ না করতে বারংবার অনুরোধ করা হয়েছে তথাপি তিনি কর্ণপাত করেন নি। তালেবানের তৎকালীন ইমারাহ যেমন একটি স্বাধীন ইমারাহ ছিল ঠিক তেমনি ইরাকের দাওলাহও একটি স্বাধীন ইমারাহ ছিল–কোন রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর আনুগত্যে বা অধীনে ছিল না। আর ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী নিজে তালেবানের অধীনস্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি অন্য আরেকটি স্বাধীন

ইমারাহ'র বাইআত ভঙ্গকারী জুলানীর বাইআত গ্রহণ করা এবং জাবহাতুন নুসরাহ'কে শামে আল-কায়দার শাখা হিসেবে ঘোষণা করার মাধ্যমে তিনি-ই মু'মিনদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা প্রতিষ্ঠিত করেন—ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। দাওলাহ'র নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি খিয়ানতকারী জুলানীর বাইআত গ্রহণ করার দ্বারা উম্মাহ'র মাঝে বিভক্তির এক দেয়াল টানলেন। সাথে সাথে চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। হে ডাক্তার! আপনি উম্মাহ'কে এক অপূরণীয় ক্ষতির মুখে ঠেলে দিলেন, ঠেলে দিলেন এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে। এই প্রবাহিত রক্তের সব দায়ভার আপনারই, আপনার নির্বুদ্ধিতার কারণেই এসব ঘটেছে।

প্রিয় পাঠক! আপনি অবশ্যই জানেন যে, ডাক্তার সাহেবকেও ফাঁকি দিয়েছে জুলানী। খিয়ানতকারী মুরতাদ জুলানীর মুখোশ উম্মাহ'র সামনে আরেকবার উন্মোচিত হয়েছে। যেভাবে দাওলাহ'র সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘতকতা করেছে ঠিক সেভাবেই ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যুগে যুগে খিয়ানতকারীরা এমনই ছিল। এ ক্ষেত্রেও ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি করেছে। সুতরাং মু'মিনদের মাঝে বিভক্তি তৈরি করেছে ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী এবং আবু মুহাম্মাদ জুলানী। দাওলাতুল ইসলাম কখনোই মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি তৈরি হোক তা চায়নি এবং দাওলাহ কখনোই বিভক্তি তৈরি করেনি। দাওলাহ-ই পৃথিবীর আনাচেকানাচে অবস্থানরত মুজাহিদগণকে এক ইমাম এবং এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান করে। শুধু তাই নয় বরং দাওলাহ'র নেতৃবৃন্দ নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী মুসলিমদের ঐক্যের পথ আরো সুগম করে দিয়েছেন—আলহামদুলিল্লাহ। এ পর্যায়ে আমরা আমাদের পূর্বের আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি– আমীরুল মু'মিনীন শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ﷾ দাওলাতুল ইসলাম ফীল ইরাক ওয়াশ শাম ঘোষণা করার পর জুলানী বিশ্বাসঘাতকতা করলেও জুলানীর অধীনস্ত সবাই জুলানীর অনুসরণ করেনি। বরং তারা দাওলাহ'র কেন্দ্রীয় আমীরের আদেশের অনুসরণ করে এবং জুলানীকে ত্যাগ করে। যেমন– রাক্কাহ'র প্রায় সবাই জুলানী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হালাবে

৮০% জুলানী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ইরাক শামের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সবাই জুলানীকে ত্যাগ করে। দামেস্ক এবং দামেস্কের পল্লী অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যায়। কেউ দাওলাহ'র কেন্দ্রের অধীনে থেকে যায় আর কেউ জুলানীর সাথে যোগ দেয়। দার'আ অঞ্চলের সবাই জুলানীর সাথে যোগ দেয়। দেইরায-যোর এ দামেস্কের মত অবস্থা হয়। 'জাইশুল মুহাজিরীন ওয়াল আনসার' এর আমীর শাইখুল মুজাহিদ আবু ওমার আশ -শিশানী ﷺ তার অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে দাওলাহ'কে বাইআত দেন। এছাড়াও অন্য অনেকে দাওলাহ'তে যোগদান করেন।

প্রিয় ভাইগণ! আমি বুঝাতে পেরেছি যে, এই ফুরক্বাত তথা বিভক্তির জন্য নিরঙ্কুশভাবে জুলানী এবং ডাক্তার যাওয়াহিরী দায়ী। দাওলাহ এর থেকে মুক্ত। কারণ তারা শুধু বিভক্তি সৃষ্টি করেই ক্ষ্যান্ত থাকেনি বরং দাওলাহ'কে খারিজি ফাতাওয়া দিয়ে সবাইকে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেছে। বস্তুত আমরা দেখতে পাই, সাহওয়াতরা হালাবের পল্লী এলাকার আতারিবে দাওলাহ'র ঘাটিতে হামলা করে অনেক আনসার এবং মুহাজিরগণকে হত্যা করে। আর এই হামলা করার মাধ্যমেই সাহওয়াতরা দাওলাহ'র বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। আর যে প্রথমে শুরু করে সেই অধিক জালিম। তারাই উম্মাহ'র মাঝে পরস্পর লড়াইয়ের সূচনা করে। ঐ সময়টাতে দাওলাহ নুসাইরিদের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আর এর সুযোগ নিয়ে সাহওয়াতরাই বিভিন্ন স্থানে দাওলাহ'র উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। এই সমস্ত হামলাগুলোতে দাওলাহ'র ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিজরত করে আসা মুহাজির নারী-পুরুষদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করে–ওয়াল-ইয়াযু বিল্লাহ্। এভাবে তারা দিনের পর দিন নিকৃষ্ট সব অপরাধ সংঘটিত করতে থাকে। এই ঘটনা প্রবাহগুলোর আলোকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, একটি পরস্পর লড়াই অবশ্যম্ভাবী। কারণ যেহেতু শামে মুসলিমদের প্রধান শত্রু নুসাইরী বাহিনী এবং এর মিত্ররা। আর দাওলাহ নিরবিচ্ছিনভাবে নুসাইরীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আসছিল। অপরদিকে শামের সাহওয়াতরা বারবার দাওলাহ'র উপর অতর্কিতে হামলা করছিল। সাহওয়াতদের হামলার কারণে নুসাইরীদের বিরুদ্ধে দাওলাহ'র যুদ্ধ বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। তাই বিষয়টি

সময়ের দাবি যে, সাহওয়াতদেরকে দমন করা হবে যেন নুসাইরীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মনোনিবেশ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে দাওলাহ সাহওয়াতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। আর এই পরস্পর লড়াইয়ের দায়ভারও কোনভাবেই দাওলাহ'র উপর বর্তায় না। খলীফাতুল মুসলিমীন শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ﷾ এর বক্তব্য আমাদের দাবির ব্যাপারে সত্যায়ন করে। তিনি তার এক বক্তব্যে দাওলাহ'র সৈনিকদের উদ্দেশ্যে করে বলেন, "আপনারা এমন ব্যক্তিদের থেকে বিরত থাকুন যারা আপনাদের থেকে বিরত রয়েছে। আপনাদের অস্ত্র তাদের দিকে তাক করুন বিভিন্ন দলের মধ্য থেকে যারা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আর ক্ষমা এবং নম্রতাকে প্রাধান্য দিন যেন আহলুস সুন্নাহ'র জন্য ওঁৎপেতে থাকা এক শত্রুর প্রতি আপনারা মনোযোগ দিতে পারেন।" সুবহানাল্লাহ্! যে সাহওয়াতরা প্রথমে দাওলাহ'র উপর আক্রমণ করল তাদের ব্যাপারে যেন ক্ষমা ও নম্রতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় দাওলাহ'র আমীর তার সৈনিকদেরকে সেই আদেশ দিচ্ছেন। আহা! কতইনা বড় মহানুভবতা! কতইনা উদারতাপূর্ণ আহ্বান! এই সাহওয়াতরা দাওলাহ'কে খারিজি, তাকফীরী ও জাহান্নামের কুকুর বলে আখ্যায়িত করত। এরপরেও দাওলাহ'র আমীর তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "আপনারা আপনাদের হিসাব পুনরায় কষে নিন এবং আপনাদের রবের নিকট তাওবা করুন। আপনারা তো আমাদেরকে অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে আক্রমণ করেছেন এবং পিছন থেকে গাদ্দারি করে আমাদের আঘাত করেছেন যখন অল্পসংখ্যক ছাড়া আমাদের সকল সৈন্য ময়দানে ও রিবাতে ছিল। এরপরেও আপনারা আমাদের অল্প শক্তি দেখেছেন এবং আজকের ও অতীতের মাঝে পার্থক্য দেখতে পাবেন। আর আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পূর্বে নিরাপদে ঘুরাফেরা করতেন এবং নিশ্চিন্তে ঘুমাতেন। কিন্তু আপনারা যে ভয় আর আতঙ্ক তৈরি করেছেন এর জন্য আপনারা রাত্রি জেগে থাকবেন এবং পাহারা বসাবেন। সুতরাং এই দাওলাহ আপনাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে যেন আপনারা এর থেক দূরে থাকেন। তাহলে দাওলাহও আপনাদের থেকে দূরে থাকবে যেন আমরা সকলে রাফিদী নুসাইরীদের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি। তবে এটা জেনে রাখুন! এই দাওলাহ'র এমন পুরুষ রয়েছে যারা বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে না, যাদেরকে দূরের কাছের সকলেই চিনে।"

কিন্তু আবু বকর আল-বাগদাদীর এই আহ্বানের পরেও সাহওয়াতরা দাওলাহ’র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বন্ধ করেনি– أللهم أشكوا إليك بثي وحزني

আল–কায়দা ও তার মিত্রদের কারণেই দাওলাতুল ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছেঃ

আল-কায়দা ও তার মিত্রদের কারণে দাওলাতুল ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। জুলানী শুধুমাত্র দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ’র মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তা নয় বরং সে দাওলাহ’র সাথে খিয়ানত করেছে এবং দাওলাহ’র পিঠে ছুরিকাঘাত করেছে। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা দাওলাতুল ইসলামের অগ্রাভিযানে দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা দেখি, আলহামদুলিল্লাহ, দাওলাতুল ইসলাম আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহে দামেস্কের উপশহরে পৌঁছে গিয়েছিল। নুসাইরী বাহিনী দাওলাহ’র সৈনিকদের সামনে হয় কচুকাটা হচ্ছিল নতুবা পালানোর পথ খুঁজছিল। কিন্তু বরাবরের মতই মুসলিম নামধারী গাদ্দাররা পিছন হতে ছুরি মেরে দিল। শামে একে অপরকে আঘাত করার বীজ দাওলাহ রোপণ করেনি এবং সেটা দাওলাহ’র থেকেও শুরু হয়নি–যা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। বরং ইরাকের সাহওয়াতদের ন্যায় একই নিকৃষ্টতার পুনরাবৃত্তি করেছিল শামের সাহওয়াতরা। সাহওয়াত ও বিভিন্ন দলের ব্যাপারে দাওলাহ’র পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। তথাপি তারা নিশ্চিতভাবেই জানতো যে, কোন কারণ ছাড়াই সাহওয়াতরা দাওলাহ’র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কেননা ইরাকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসলামের নামে কিছু সাহওয়াত গ্রুপ সেখানেও ছিল। যারা সর্বদাই মুজাহিদদেরকে খারিজি, তাকফীরী অপবাদ দিয়ে এসেছে। দাওলাহ তখনো পরিপূর্ণরূপে নুসাইরীদের বিরুদ্ধে অভিযানে ব্যস্ত। নুসাইরীদের নিকট দাওলাহ ছিল এক আতঙ্কের নাম–আল্লাহর অনুগ্রহে এখনো তা বাকি আছে। দাওলাহ যখন নুসাইরীদের উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন সাহওয়াতরা হালাবের পল্লী এলাকা আতারিবে দাওলাহ’র সাথে গাদ্দারি করে। তারা দাওলাহ’র ঘাটিগুলোতে

আক্রমণ করে সকল প্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং ব্যারিকেড দিয়ে দেয়। আর তখন বহুসংখ্যক মুজাহিদদের হত্যা করা হয়। এই গাদ্দারির পরিপ্রেক্ষিতে দাওলাহ নিজেদের ঘাটিগুলোর প্রতিরক্ষা করার উদ্দেশ্যে নুসাইরীদের বিরুদ্ধে সকল অপারেশনের পরিকল্পনা স্থগিত করে। সাহওয়াতদের গাদ্দারির গল্প শুনুন খোদ দাওলাহ'র সেনাপ্রধান আবু ওমার আশ-শিশানী ﷫ এর থেকে। তিনি বলেন, "আমরা হালাবের উত্তরাঞ্চলের পল্লী এলাকায় আমাদের ঘাটিসমূহ খালি রেখে নুসাইরীদের কাছ থেকে এলাকাসমূহ মুক্ত করতে গিয়েছিলাম। তারা বিশ্বাসঘাতকের মত আমাদের উপর হামলা করেছে। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আল-খাইরে অভিযান বন্ধ করতে হয়েছে।" তাদের এ বিশ্বাসঘাতকতার জবাবে দাওলাহ'র সেনাপ্রধান আবু ওমার আশ-শিশানী ﷫ দেইরায-যোর থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পথ সফর করে এসে আল-বাব শহর সাহওয়াতদের থেকে মুক্ত করেন। দাওলাহ নুসাইরীদের থেকে শামের ভূমি মুক্ত করতে ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে গাদ্দার সাহওয়াতরা দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে।

সুতরাং মুজাহিদদের অগ্রাভিযানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে শামের সাহওয়াতরা। দাওলাহ বাধ্য হয়ে যুদ্ধের মোড় নুসাইরীদের দিক থেকে সাহওয়াতদের দিকে ঘুরিয়েছে। কারণ সাহওয়াতরা দাওলাহ'র ঘাটিগুলোতে হামলা চালানো শুরু করে। আর দাওলাহ তখন ইক্বদামী অভিযান বন্ধ করে নিজেদের প্রতিরক্ষায় মনোযোগী হয়। অতএব ইরাক শামে দাওলাহ'র অগ্রাভিযান শিথিল হওয়ার জন্য শামের আল-কায়দা এবং এর মিত্ররা দায়ী। লিবিয়াতে আল-কায়দা ও তার সাহওয়াত জোট দায়ী। ইয়েমেনেও একই অবস্থা। এমনিভাবে খোরাসানেও মুরতাদ তালেবান আমেরিকার সাথে মিলে যৌথ অভিযান চালিয়ে দাওলাহ'কে বাধাগ্রস্ত করেছে। সর্বোপরি, আল-কায়দা ও তার মিত্রদের কারণে দাওলাহ'র অগ্রাভিযান ব্যাহত হয়েছে এবং কিছু ভূমি হাতছাড়া হয়েছে। তবে আমাদের কাছে যুদ্ধে ভূমি হারানো মুখ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয় হচ্ছে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ ও মানহাজের উপর টিকে থাকা এবং এর উপর মৃত্যুবরণ করা। এমন ভূমির কী-বা মূল্য আছে

যদি সেখানে গায়রুল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়! কাফিরদের তাবেদারী করে ভূমি টিকিয়ে রাখার চেয়ে ভূমিহীন অবস্থায় কারাগারে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়।

আল–কায়দা গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, সেকুলার ও জাতীয়তাবাদী দলগুলোর সাথে মিলে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেঃ

বিগত প্রায় ১ দশক ধরে অনেক ঘটনাই ঘটেছে। খুব কম সংখ্যক মুসলিমই ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত। যেগুলো ইসলামী রাষ্ট্র এবং তানযীম আল-কায়দা ও তার বিভিন্ন মিত্রদের মাঝে সংঘটিত হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা না জেনে অনেকেই উলামায়ে সু'দের কথা সত্যায়িত করে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর বিভিন্ন ধরনের মতামত পোষণ করছে। অনেকেই মনে করেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র আল-কায়দার লোকদের উপর বাড়াবাড়ি চিন্তা প্রসূত প্রথমে হামলা করেছে, ইসলামী রাষ্ট্র তথা দাওলাতুল ইসলাম মুসলিমদের হত্যা করে এবং মুশরিকদের ছেড়ে দেয়। এগুলো ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আরোপিত প্রভৃতি অপবাদকে তারা সঠিক বলে ধরে নিয়েছে। আর মানুষের কাছে ইসলামী রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে কাফিরদের মিডিয়া এবং মুসলিম নামধারী মুরতাদদের মিডিয়াগুলো তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করে। আল-কায়দার হলুদ মিডিয়াগুলোও মিথ্যা সংবাদ এবং অপপ্রচারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই কোন অংশেই, বরং তারা কুফফারদের মিডিয়া থেকে একধাপ এগিয়ে। এতদিনে আমার এই কথার সত্যতা অনেকটাই উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং আল-কায়দার মিডিয়াগুলোর দ্বিমুখিতাও আপনাদের সামনে দৃশ্যমান। যাইহোক আমরা শাম, লিবিয়া, মালি, সোমালিয়া এবং ইয়েমেনে যা হয়েছে এর প্রকৃত বাস্তবতা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। যাতে হক্বপন্থিদেরকে অপবাদমুক্ত করা যায় এবং বাতিলপন্থিদের বাতিল হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়।

আল-কায়দার সাথে শত্রুতা শুধুমাত্র শারয়ী রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণের উপর ভিত্তি করে নয়–যা আল-কায়দার নেতারা এবং এর শাখাসমূহ করে থাকে। আল-কায়দার সাথে শত্রুতা শুধুমাত্র আক্বীদাহ'র মাসআলাসমূহে বিচ্যুতির

মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। আক্বীদাহ’র মাসআলায় বর্তমান আল-কায়দার বিচ্যুতি এই স্তরে পৌঁছেছে যে, যারা সুস্পষ্ট শিরক করে যেমন- মৃত ব্যক্তির নিকট দু’আ করে বা যারা মনে করে মৃত ব্যক্তি অনিষ্টতা দূর করতে পারে ও উপকার করতে পারে, এমন লোককে তারা ইসলামের হুকুম দেয়। এমনকি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার-ফায়সালাকারী তাগুতদের মুসলিম বলে আখ্যায়িত করে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আইন প্রণয়নকারীদেরকেও মুসলিম বলে থাকে। যেমন- যারা গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টসমূহের সদস্য হয় তাদেরকে আল-কায়দা তাকফীর করে না কেবলমাত্র দলের নামের আগে বা পরে ‘ইসলাম’ শব্দ থাকার কারণে। বছরের পর বছর ধরে যারা নিজেদের বানানো আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করে আল-কায়দা তাদেরকেও তাকফীর করে না। এমনকি বারো ইমামিয়্যাহ রাফিদীদেরও মুসলিম মনে করে—যারা বিভিন্ন ধরনের শিরক কুফরে লিপ্ত। আল-কায়দার সাথে শত্রুতা মূলত এসব কারণের উপর ভিত্তি করে নয়। বরং আল-কায়দার সাথে শত্রুতার ভিত্তি হল - যারা পূর্বে উল্লেখিত মুশরিকদের তাকফীর করে তাদেরকে আল-কায়দা বাড়াবাড়ি এবং খারিজি অপবাদ আরোপ করে থাকে। অথচ পূর্বে তারাও আইন প্রণয়নকারী তথা পার্লামেন্ট সদস্যকে তাকফীর করত - চাই ইসলামের নামে বা অন্য যেকোনো নামেই হোক না কেন - এবং রাফিদীদের তাকফীর করত। আল-কায়দার বিভিন্ন শাখা ইসলামী রাষ্ট্রের সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দ্বীন ত্যাগী দলগুলোর সাথে প্রকাশ্য ওয়ালা করে। আর দ্বীন ত্যাগী দলগুলোর সাথে ওয়ালা করার বিষয়টি একদমই স্পষ্ট।

আজ আমরা প্রত্যেক স্থানেই দেখতে পাই যে, আল-কায়দার সৈনিকরা ইসলামী রাষ্ট্রের সৈনিকদের মধ্য থেকে যার ক্ষেত্রে তারা সক্ষম হয় তাকেই হত্যা করছে। যে সমস্ত স্থানে তাদের সাথে সশস্ত্র কোন সংঘাত তৈরি হয়নি সেখানে তারা সশস্ত্র কার্যক্রম ব্যতীত অন্য সকল পদ্ধতিতে চরম শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। বিশেষকরে তারা আমাদের উপমহাদেশে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে সব ধরনের অপপ্রচার চালায়। ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের প্রকাশিত লেখনি এবং তাদের ভিডিওগুলোতে ভিত্তিহীন তথ্য ও প্রোপাগান্ডার ছড়াছড়ি থাকে। মিডিয়াতে এবং

মিডিয়া ছাড়াও ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল ও সামাজিক পরিমণ্ডলে সবখানেই আল-কায়দার সৈনিক এবং চিন্তা চেতনায় অনুপ্রাণিত লোকজন ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রকাশের সম্ভাব্য সবকিছু করে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র এবং এর অনুগত সৈনিকদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রকাশ করেই তারা ক্ষ্যান্ত থাকে না। বরং আল-কায়দার বাঙ্গালী শাখা তাদের অন্যান্য শাখার অনুকরণ করে দাওলাতুল ইসলামের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং মুহিব্বীনগণের গোপনীয়তা প্রকাশ করছে। কখনো কখনো বিষয়টা এমন হয় যে, যারাই তালেবানের রিদ্দামূলক কর্মকাণ্ড দেখে এবং আল-কায়দার কতক শাখার রিদ্দামূলক কাজ ও বাদবাকিদের চরম পথভ্রষ্টতা দেখে তাদের পক্ষে কথা বলে না–এমন ব্যক্তিদেরকে তারা দাওলাতুল ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত বলে প্রচার চালায়। দাওলাতুল ইসলামের সাথে কোন সম্পৃক্ততা না থাকার পরেও আল-কায়দা অনেককে দাওলাতুল ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত বলে প্রচার চালানোর কারণটা হল এই, যেন তাগুতের সৈনিকদের নিকট উক্ত ব্যক্তিকে দাওলাহ’র সাথে সম্পৃক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আর কোন ব্যক্তি তাগুতের সৈনিকদের নিকট দাওলাহ’র সাথে সম্পৃক্ত হিসেবে চিহ্নিত হলে এর ফলাফল কী হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল-কায়দার সৈনিকরা এই কাজগুলো করে কেবলমাত্র তাদের ভ্রষ্টতার পক্ষে কথা না বলার কারণে। দ্বীনদার মুসলিম, উলামা-ত্বলাবাগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এক ধৃষ্টতাপূর্ণ খেলায় মেতে উঠেছে এদেশীয় আল-কায়দা। আল্লাহ ওদের ষড়যন্ত্রকে ওদের দিকেই ফিরিয়ে দিক! আল-কায়দার এহেন অপকর্মের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ, সংগত কারণেই অপকর্মগুলো সবিস্তারে উল্লেখ করছি না আমরা। ইসলামী রাষ্ট্রের সৈনিকদের সাথে আল-কায়দা মুরতাদদের সাথে আচরণ করার মত আচরণ করে থাকে। যেমন- দাওলাহ’র সৈনিকদের আহতদের হত্যা করা, তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া ও বৈধ মনে করা এবং তাদের মৃতদেহ রাস্তা ও মরুভূমিতে ফেলে রাখা। আল-কায়দা মুখে দাওলাহ’কে খারিজি বলে (অধিকাংশ আলিমের মতে খারিজিরা মুসলিম, মুরতাদ নয়) কিন্তু বাস্তবে তারা মুরতাদদের মত আচরণ করে ইসলামী রাষ্ট্রের সৈনিকদের সাথে। আল-কায়দা যে সমস্ত দলের ব্যাপারে কুফর ও রিদ্দাহ’র হুকুম দেয় ঐ সমস্ত দলের নেতা এবং সদস্যরা তাদের মাঝে সম্মান ও মর্যাদার সাথে অবস্থান করে। একই সাথে আল-

কায়দা কোন দলকে তাকফীর করে এবং সাথে সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উক্ত তাকফীরকৃত দলকে সাহায্য করে। কোন দলকে তাকফীর করে আবার ওই দলের সাথে ওয়ালা করে। এমন ঘটনা ইয়েমেন, শাম এবং লিবিয়াতে ঘটেছে।

আমরা প্রথমে এই বিষয়টি প্রকাশ্যে ও সুস্পষ্টভাবে দেখেছি শামে আল-কায়দার শাখার মাঝে–যার নেতৃত্ব দিত মুরতাদ জুলানী এবং জুলানীর সহযোগী খুরাসান থেকে আগত আল-কায়দার নেতৃত্বের কয়েকজন। তারা এমন সব দলের সামরিক কাউন্সিল এবং কমিশনের সাথে জোট বেধেছিল যাদের কুফরের ব্যাপারে তারাই স্বীকৃতি দিত। শামে আল-কায়দার শাখা উক্ত কাউন্সিল ও কমিশনের সাথে মিলে শামের পূর্বাঞ্চলে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জোটবদ্ধ হয়েছিলো। হালাবের দক্ষিণ পল্লী এলাকাতেও তারা একই কাজ করেছে। শামে আল -কায়দা জাতীয়তাবাদী সেকুলার এবং গণতান্ত্রিক অনেক সাহওয়াত দলের সাথে মিত্রতা করেছে, জোটবদ্ধ হয়েছে। এমনকি নাস্তিক পিকেকের সাথে মিলেও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আমরা এখানে আল-কায়দার মিত্রদের নাম ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করছি-

১. জাইশুল হুর।

২. জাবহাতুল ইসলামীয়্যাহ।

৩. আহরার আশ-শাম।

৪.ফাইলাক আশ-শাম।

৫. পিকেকে।

৬. শামিয়্যাহ ফ্রন্ট।

৭. হারাকাত নুর-উদ্দীন যিনকী।

৮. হারাকাতে হাযম।

৯. জাইশুল মুজাহিদীন।

১০. আল-ইত্তিহাদ আল-ইসলামী লি-আজনাদিশ-শাম।

১১.হারাকাতুল জিহাদ ওয়াল-বিনা।

১২. হারাকাতু আসালাহ ওয়াত-তানমিয়্যাহ।

আমরা যে দলগুলোর নাম উল্লেখ করলাম এই দলগুলো ছাড়াও আরো অনেক দল ছিল বা এখনো আছে যাদের সাথে আল-কায়দা মিত্রতা করেছে। আমাদের অনুল্লেখিত কিছু দল বিলুপ্ত হয়েছে আগেই। আর কোনটির অস্তিত্ব থাকলেও তা কেবলই নামসর্বস্ব। যাইহোক আমরা এই বারোটি দলের নাম উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করছি।

এবার আমরা আলোচনা করব লিবিয়ায় আল-কায়দার শাখা সম্পর্কে। আল-কায়দার লিবিয়া শাখা ছিল বিলাদ আল-মাগরিবের নেতাদের তত্বাবধায়নে। সেখানে তারা খিলাফাহ'র সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধে তারা মুরতাদদের সাহায্য করেছে। আল-কায়দা ত্রিপোলি এবং দারনায় তাগুত খলিফা হাফতারের মুরতাদ বাহিনী ও অন্যান্য দ্বীন ত্যাগী দলগুলোর সাথে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে জোটবদ্ধ হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। অতঃপর উক্ত জাতীয়তাবাদী সেকুলার জোটের সাথে মিলে সরকার গঠন করেছে এবং লিবিয়ায় আল-কায়দার শাখা বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে। ইসলাম থেকে বের করে দেয় এমন ওয়ালা সম্পাদন করার মাধ্যমে রিদ্দা'র ষোলকলা পূর্ণ করে। এর মাধ্যমেই নিক্ষিপ্ত হয় ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে।

এখন আমরা দৃষ্টি দিতে চাই আল-কায়দার ইয়েমেন শাখার দিকে। আমরা আল-কায়দার ইয়েমেন শাখাকে দেখি তারা ক্বীফাসহ অন্যান্য স্থানে আমাদের মুজাহিদ ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। লিজানুশ শা'বীয়্যাহ নামক কোয়ালিশনের সাথে জোট বেধে তারা একাজ করেছে। আর বলে রাখা ভালো যে, লিজানুশ শা'বীয়্যাহ এডেনের মুরতাদ সরকারের অনুগত একটি দল। আল-কায়দার ইয়েমেন শাখার নেতারা এই লিজানুশ শা'বীয়্যাহ'কে তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তারা তাদেরকে আহলুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতা বানিয়েছে। আল-কায়দা ইয়েমেনের তাগুত সরকারের সাথেও মিত্রতা করেছে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। আরো বিভিন্ন ধরনের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাদের মৈত্রীতার ব্যাপারে কিন্তু আমরা উক্ত সংবাদগুলো নির্ভরযোগ্য সূত্রে যাচাই করতে পারিনি। তাই উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি। এমনিভাবে আমরা মালিতে আল-কায়দাকে

দেখি তারা জাতীয়তাবাদী সংগঠন খালাছ আযওয়াদের সাথে মিত্রতা করে। তারা শুধু মিত্রতা করেই ক্ষ্যান্ত থাকেনি বরং আল-কায়দা এবং খালাছ আযওয়াদ মিলে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা পৌত্তলিক গোত্র দোনঝোর সাথেও মিত্রতা করেছে। তালেবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল-কায়দা সাহারা অঞ্চলে দাওলাহ'কে প্রতিরোধ করতে মালির সরকারের সাথে আলোচনা ও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

প্রিয় পাঠক! আমরা আপনাদের সামনে স্বল্প পরিসরে হলেও আল-কায়দা যে বিভিন্ন স্থানে গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী, সেকুলার দ্বীন ত্যাগী দলগুলোর সাথে মিত্রতা করে এবং উক্ত দলগুলোর সাথে মিলে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, মুসলিমদের হত্যা করে–তা উল্লেখ করতে পেরেছি–আলহামদুলিল্লাহ। আশাকরি বুঝতে পেরেছেন।

আল–কায়দার মিত্রদের অবস্থাঃ

আমরা এ পর্যায়ে আল-কায়দার মিত্রদের অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করব ইনশা'আল্লাহ। প্রথমে শুরু করব শামে আল-কায়দার মিত্রদের নিয়ে। শামে আল-কায়দার মিত্রদের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে জাইশুল হুর ফী সুরীয়া বা ফ্রি সিরিয়ান আর্মি। শামে আল-কায়দার মিত্র সাহওয়াতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে দলগুলো ছিল এর মধ্যে রয়েছে, আহরার আশ-শাম, জাবহাতুল ইসলামিয়্যাহ, নুরুদ্দীন যিনকী। এই দলগুলো ছিল কট্টর জাতীয়তাবাদী। আর এগুলোর কিছু হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। এদের অবস্থা এখন আল-কায়দাই বর্ণনা করে বেড়ায়। আজ থেকে দশ বছর আগে দাওলাহ এই সমস্ত দলকে যে কারণে সাহওয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল আজ আল-কায়দা সেই একই কারণে উক্ত দলগুলোকে তাগুতদের সাথে মিত্রতাকারী ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হিসেবে আখ্যায়িত করছে। বরং আল-কায়দার কেউ কেউ তো এই দলগুলোর ধ্বংস কামনা করছে। এই দশ বছরের ব্যবধানে শামে আল-কায়দার মিত্রদের মাঝে কী পরিবর্তন হয়েছে?

তেমন কিছুই পরিবর্তন হয়নি কেবল আল-কায়দার সদস্যদের হত্যা করা ছাড়া। আরবের তাগুত সরকারদের সাথে মিত্রতা করা, তুর্কী তাগুতের সাহায্য নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, পশ্চিমা সরকার ও জাতিসংঘের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, এদের কাছে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে সাহায্য ভিক্ষা চাওয়া এবং শারীয়াহ দ্বারা শাসনকৃত ভূমি থেকে শারীয়াহ অপসারণ করা–এই ধরনের জঘন্য অপকর্ম সম্পাদন করেছে শামে আল-কায়দার মিত্ররা। যদিও আল-কায়দার এই সমস্ত মিত্র দলের দু'একটি শুরুতে মুখে ইসলামের কথা বলত। কিন্তু প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে ওদের আসল রূপ প্রকাশ হতে থাকে। তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিত যে, তারা একটি সিরিয়ান জাতীয়তাবাদী, নাগরিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আল-কায়দার প্রধান মিত্র দলের এক নেতা হচ্ছে সালিম ইদরিস। সে সিরিয়ান বিপ্লবের শুরু থেকেই পশ্চিমা গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখত। নুসাইরীদের বিরুদ্ধে যেন তাদের সাহায্য করা হয় সেই দাবি পশ্চিমা সরকারদের প্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরত। ইসলামিক ফ্রন্টের নেতা জাহরান আল্লুশ– যে দাওলাহ'কে খারিজি আখ্যায়িত করে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সকলকে প্ররোচিত করত, সে ছিল একজন গণতন্ত্রপন্থী জাতীয়তাবাদী। এছাড়াও এই দলগুলোর লক্ষ্য ছিল একটি স্বাধীন সিরিয়ান রাষ্ট্র গঠন করা–যেখানে সকল চিন্তা-চেতনার লোকজন জায়গা পাবে। দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল-কায়দা এই সমস্ত দলের সাথে জোট বেধেছিল। দাওলাতুল ইসলামের একজন শাইখ তখন বলেছিলেন, আজ আল-কায়দা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যে জোটে প্রবেশ করেছে একদিন সেই জোটই আল-কায়দাকে হত্যা করবে। বর্তমান অবস্থা আমাদের সকলের সামনে স্পষ্ট। আল-কায়দার মিত্র দলগুলো কি এই দশ বছরে তাদের শাসনাধীন ভূমিতে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছে! বরং দাওলাহ যে ভূমিগুলোতে শারীয়াহ'র বিধিবিধান বাস্তবায়ন করত সেই ভূমি দাওলাহ'র থেকে দখল করে সেখানে গাইরুল্লাহর বিধিবিধান বাস্তবায়ন করেছে আল-কায়দার মিত্র গোষ্ঠী। কুফরি বিধান দ্বারা শাসনকৃত ভূমি দখলের পর শারীয়াহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়টি এক কিন্তু যারা শারীয়াহ দ্বারা শাসনকৃত ভূমি থেকে শারীয়াহ'র বিধান অপসারণ করে গাইরুল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করে তাদের অবস্থা কী হবে তা আর বলার অপেক্ষা

রাখে না। আমরা আল-কায়দার মিত্রদের কদর্যতাপূর্ণ অবস্থা আপনাদের নিকট তুলে ধরতে তাদেরই প্রকাশ করা ঘোষণা পত্রের কিছু পয়েন্ট তুলে ধরব।

আল-কায়দার প্রধান মিত্র দলগুলোর একটি হল আহরার আশ-শাম। এই আহরার আশ-শাম তুর্কী কাফির সরকারের অনুগত এবং সিরিয়ায় তুর্কী সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। আহরার আশ-শামের রাজনৈতিক অফিস থেকে 'উত্তর সিরিয়ায় একটি নিরাপদ অঞ্চল' শিরোনামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। সেখানে তারা বলেছে, *"এটি একটি অকাট্য সত্য বিষয় যে, গত চার বছর যাবত তুরস্কের সরকার এবং তুরস্কের জনগণ যেভাবে সিরিয়ান জনগণকে এবং সিরিয় বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সাহায্য করে এসেছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তা ভাবার বিষয়। তাদের এই সু-বিস্তৃত সাহায্য সত্ত্বেও তুরস্কের জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে এবং তুরস্কের সরকারের উপর দেশীয় ও বৈদেশিক বিরাট চাপ পড়েছে। অথচ তুরস্ক সবসময়ই আমাদের জনগণকে এবং আমাদের বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নৈতিক ও মানবিকভাবে সাহায্য করে এসেছে। আর এ ব্যাপারে তারা সবসময় অটল ছিল। তুরস্কের এই সু-বিচারপূর্ণ ও দায়িত্বশীল অবস্থানের কারণে তুরস্ক সিরিয় বিপ্লবের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তারা এই দুই দেশের জনগণের মধ্যে সাধারণ স্বার্থের নতুন পথ বের করেছে, হয় দেশীয় স্বার্থ নয়তো আঞ্চলিক স্বার্থ। সম্প্রতি সাধারণ স্বার্থের একটি হচ্ছে দায়েশের (দাওলাতুল ইসলামের) বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। দায়েশ মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করার মাধ্যমে বিপ্লবের অগ্রযাত্রাকে তছনছ করে দিয়েছে এবং সেই সাথে আবার তুরস্কের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের ব্যাপারে হুমকি প্রদান করেছে। বাশার আল-আসাদের সাম্প্রদায়িক নীতি এবং দায়েশের মূর্খ নীতি সিরিয়াকে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ ও প্রক্সি যুদ্ধের রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে। ফলে সিরিয়ান জনগণের মিত্রদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে।"*

এই সমস্ত বিষয় জানার পরেও আল-কায়দা এই দলের সাথে মিত্রতা করেছে এবং দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে জোট বেধেছে। শামে আল-কায়দার আরেক মিত্র হচ্ছে জাইশুল মুজাহিদীন। আল-কায়দার অন্যান্য মিত্রদের ন্যায় এই দলটিও

দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে তুর্কী সরকারকে নিরঙ্কুশ সাহায্য করার ঘোষণা দিয়েছিল। জাইশুল মুজাহিদীন তাদের এক অফিসিয়ালি বিবৃতিতে বলেছে, *"জাইশুল মুজাহিদীনের নেতারা তুরস্ক, তার সরকার ও জনগণের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে তুরস্কের একজন সৈন্য ও নাগরিক সন্ত্রাসী দাওলাহ ও পিকেকে পার্টির হাতে নিহত হওয়ায়। আমরা জাইশুল মুজাহিদীন তুরস্কের জনগণ ও সরকারকে সন্ত্রাসী দাওলাহ ও পিকেকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংহতি ও পুরোপুরি সাহায্য করব... আমরা তুরস্কের ভাইদের সাথে একই খন্দকে দাঁড়াব এবং এই হত্যাকে সিরিয়ার মানুষদের প্রতি তুরস্কের সমর্থনের প্রতি এক আঘাত হিসেবে বিবেচনা করব।"*

আমরা জানি যে, তুরস্ক হচ্ছে ক্রুসেডার ন্যাটো জোটের সদস্য। এই জোটটি ক্রুসেডার ও আমেরিকার পরিচালিত বিভিন্ন সামরিক অভিযানে অংশ নেয়। তুরস্কের এই জোট পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। আর তুরস্ক সরকার আল্লাহর বিরোধী আইন প্রণয়ন করে, তুরস্ক সরকার ও সেনাবাহিনী তার তাগুত মিত্রদের রক্ষা করে এবং বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। এরপরেও আল-কায়দার মিত্ররা প্রকাশ্যে তুরস্কের সাথে মিত্ররা করার এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করার ঘোষণা দেয়।

আল-কায়দার অন্যান্য মিত্র দলগুলোও আরবের তাগুতদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও তাদের সাথে পরিপূর্ণ ওয়ালা করত। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে আল-কায়দা শামে এমন দলগুলোর সাথে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল যারা পশ্চিমা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করত। এই দলগুলো পশ্চিমাদেরকে আহ্বান করত তারা যেন দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করে। আহরার আশ-শামের বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের পরিচালক লাবিব আন-নাহাস তার একটি আর্টিকেলে বলেছে, *"যতই যুদ্ধ লম্বা হতে থাকবে ততই সিরিয়াকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে। আহরার আশ-শাম চায় আসাদের শাসনের অবসান ও আই.এস.আই.এল এর পরাজয় এবং দামেস্কে একটি স্থিতিশীল প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার যেটা সিরিয়াকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। আমরা এমন একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখতে চাই যা সিরিয়ার*

সংখ্যাগরিষ্ঠদের পরিচয় ও মতামতকে সম্মান করে এবং একই সাথে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করে যাতে তারা দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটা ইতিবাচক বাস্তব ভূমিকা পালন করতে পারে। আমরা সিরিয়ার ঐক্য ও সীমানা অখন্ডতাকে রক্ষিত দেখতে চাই।"

একটু পরেই সে আবার বলেছে, *"সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন সিরিয়ায় সামরিক অভিযানের বিষয়ে সরকারের নীতির পরিবর্তনের ব্যাপারে ইংগিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যুক্তরাজ্য অবশ্যই আই.এস.আই.এল এর সাথে লড়াইয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সবই ঠিক আছে। জানুয়ারি ২০১৪ থেকে এখন পর্যন্ত আমরা আইএসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ৭০০ যোদ্ধাকে হারিয়েছি এবং আমরা ও আমাদের মিত্ররা ৪৫ কিলোমিটার ফ্রন্টলাইন ধরে আছি আলেপ্পোতে । আমরা জানি আই.এস.আই.এল এর হুমকির সামনে দাঁড়ানো কতটা কঠিন। আমরা জানি আই.এস.আই.এল কেবল একটা নিরাপত্তা বা মিলিটারি হুমকিই নয় বরং সামাজিক ও আদর্শগত লড়াই বিভিন্ন স্তরে যার মোকাবেলা করা উচিত। আর এ কারণেই জাতীয় সুন্নি বিকল্পগোষ্ঠি গড়ে তুলতে হবে আসাদ ও আই.এস.আই.এল এর বিকল্প হিসেবে।"* সে একই আর্টিকেলে বলেছে, *"যেহেতু আর.এ.এফ (রয়াল এয়ার ফোর্স) আই.এস.এই.এল এর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের জন্য তৈরি, সেহেতু ব্রিটিশ সরকারের উচিত হবে জঙ্গিগোষ্ঠীদের মোকাবেলায় শুধু বোমা ফেলা ছাড়াও অন্য উপায় খুঁজে বের করা।"*

শামে আল-কায়দার মিত্রদের অবস্থা এতোই কদর্যতাপূর্ণ ছিল যে, তারা জাতিসংঘকে সিরিয়ার জনগণের স্বার্থে কাজ করার আহ্বান করত। আল-কায়দার প্রধান মিত্র দল–ফ্রি সিরিয়ান আর্মি, নুরুদ্দীন যিনকী, শামিয়্যাহ ফ্রন্ট, ফাইলাক আশ-শাম ও জাইশুল মুজাহিদীনসহ আরো কয়েকটি দল ১৫-০৯-২০১৫ তারিখে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে সেখানে তারা বলে, *"(১২) জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে সিরিয়ার বিপর্যয়ের সকল দায়দায়িত্ব নেয়ার জন্য এবং সিরিয়ার জনগণের স্বার্থের সাথে আনুষঙ্গিক অনুবন্ধগুলো বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য আমরা আহ্বান করছি।"*

এর পূর্বে তারা ৪ নং পয়েন্টে বলেছে, *“(৪) আমরা ইউএন নিরাপত্তা পরিষদের ২০১৪ সালের ২১৬৫ প্রস্তাবের উপর জোর দিতে চাই যা সিরিয়ান দ্বন্দ্বে জড়িত সকল দলসমূহকে তাৎক্ষনিকভাবে ও কোন বাধা ব্যতিরেকে জনহিতৈষী সাহায্য পৌঁছে দেয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করে, যাতে করে মানুষের নিকট এরূপ সাহায্য সরাসরি পৌঁছানো সম্ভব হয়।”*

এর কিছুদিন পরেই তারা আরেকটি বিবৃতি প্রকাশ করে সেখানে তারা বলেছে, *“দ্বিতীয়ঃ প্রকৃতপক্ষে কোন বাস্তব ফলাফল না পাওয়া সত্ত্বেও বিপ্লবী বাহিনীগুলো ও বিরোধী দল সর্বদা জাতিসংঘের দূতের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রেখেছে, তারা জোর দিয়ে ঘোষণা করছে যে, সিরিয়ার জনগণের স্বার্থে তারা জাতিসংঘের সাথে এই ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখবে।”*

অতি সংক্ষেপে শামে আল-কায়দার মিত্রদের কিছু অবস্থা তুলে ধরলাম। আল-কায়দার মিত্রদের মাঝে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র এবং কাফিরদের সাথে ওয়ালা করার মত বিষয় থাকার পরেও আল-কায়দা তাদের সাথেই মিত্রতা করেছে। এমনকি এই দলগুলোর সাথে জোট বেঁধে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আর পিকেকে কুর্দীরা যে নাস্তিক এতে কি কেউ সন্দেহ করবে! দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে এই পিকেকের সাথেও আল-কায়দা জোটবদ্ধ হয়েছিল।

লিবিয়ায় আল-কায়দার মিত্রদের অবস্থা বলতে গেলে, কেউ যদি লিবিয়ার বর্তমান শাসন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাহলে তার নিকট সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে। যে দলগুলো মিলে লিবিয়ায় সরকার গঠন করেছে তারাই ছিল আল-কায়দার মিত্র গোষ্ঠী। খলিফা হাফতারের বাহিনী–জাতীয়তাবাদী, সেকুলার ও গণতন্ত্রপন্থি। আল-কায়দা দারনাতেও খলিফা হাফতারের সাথে এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মিলিশিয়া গোষ্ঠীর সাথে দাওলাহ’র বিরুদ্ধে জোট গঠন করে যুদ্ধ করেছে। ত্রিপোলিতে তারা একই কাজ করেছে। আর এই যুদ্ধে নিরঙ্কুশভাবে আমেরিকা বিমান দিয়ে তাদের সাহায্য করেছে। বর্তমানে লিবিয়াতে কেন আল-কায়দার কোন অস্তিত্ব নেই? কেন আল-কায়দা লিবিয়ায় তাদের শাখা বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে? লিবিয়াতে

আল-কায়দার একমাত্র প্রতিপক্ষ তো ছিল দাওলাতুল ইসলাম। হ্যাঁ, লিবিয়ার বর্তমান সরকারের অস্তিত্বের সাথে আল-কায়দাও বিলীন হয়ে গেছে। আর লিবিয়ার বর্তমান সরকার যে স্রেফ ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সরকার সেটা বোধহয় নতুন করে কাউকে বলার প্রয়োজন হবে না। আল-কায়দা ইয়েমেনের ক্বীফাতে ইয়েমেন সেনাবাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ইয়েমেন সরকারের সেনাবাহিনী যে মুরতাদ এটা কি বলার অপেক্ষা রাখে! মালিতেও তারা একই কাজ করেছে–জাতীয়তাবাদী হারাকাতে আযওয়াদ নামক এক দলের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে এখনো দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

মিত্রদের আঘাতে অস্তিত্ব সংকটে শামে আল–কায়দাঃ

আল-কায়দা যাদের সাথে মিত্রতা করে ইসলামী রাষ্ট্র তথা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে কিছুদিন যেতে না যেতেই তারাই আবার ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নিজেরা নিজেরা মারামারি করেছে। শামের আল-কায়দার অবস্থা এতোটাই শোচনীয় হয়েছে যে, কিছুদিন পূর্বেও যারা পরস্পর মিত্রতা স্থাপন করে একজোট হয়ে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তারাই আল-কায়দার উপর ক্র্যাকডাউন চালিয়েছে। নেতাদের কাউকে বন্দি করছে আর কাউকে হত্যা করছে। শামে আল-কায়দার এতো সংকটাপন্ন অবস্থা নুসাইরী সরকার বা আমেরিকার মদদপুষ্ট এসডিএফের হামলার কারণে হয়নি। তাদের এ অবস্থা হাকীম সাহেবের হিকমার কল্যাণে হয়েছে। আর হাকীম সাহেব শামে তার ক্ষমতা বিস্তৃত করার জন্য দাওলাতুল ইসলামকে তার প্রতিপক্ষ বানিয়েছে। তাইতো দাওলাহ যখন জাবহাতুন নুসরাহ নাম বাতিল করে দাওলাতুল ইসলাম ফীল ইরাক ওয়াশ শাম ঘোষণা করেছে এবং যখন জুলানী তার আমীরের বাইআত ভঙ্গ করে ডাক্তার সাহেবকে বাইআত প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে তখন ডাক্তার সাহেব শামে দাওলাহ'র শাখাকে নিজে হস্তগত করে নেয়। কিন্তু কিছুদিন পরই হাকীমের হিকমা আবার ভুল প্রমাণিত হয়। আমরা জানি যে, বর্তমানে শামে আল-কায়দার অবস্থা এতোটাই শোচনীয় যে,

এখন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তারাই নিজেরা নিজেদেরকে প্রতিপক্ষ বানিয়েছে এবং তাদের কেউ এখন লাঞ্ছনার মধ্যে জীবন-যাপন করছে আর কেউ নিজেদের আঘাতের যখম নিয়ে দিন পার করছে। তথাপি দাওলাতুল ইসলাম টিকে আছে এবং দিনকে দিন বিস্তৃত হচ্ছে–আলহামদুলিল্লাহ।

ইসলামী নামধারী গণতান্ত্রিক দলের কর্মীরা (আল–কায়দার ভাষায়) দ্বীনের রক্ষক!

গণতন্ত্র একটি দ্বীন। ইসলামও আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র মনোনীত দ্বীন। মৌলিকভাবে দুইটি দ্বীন বিপরীতমুখী। এ দু'টিকে একত্র করা অসম্ভব। তথাপি গত শতাব্দীর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ইখওয়ানের হাত ধরে ইসলামের নামে গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে দুইটি দ্বীনকে একত্রিকরণের এই মতবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন যাবত সঠিক আক্বীদাহ-মানহাজ ও তাহযীব-তামাদ্দুন থেকে দূরে থাকা এই দিশেহারা উম্মাহ গণতন্ত্র নামক কুফরি মতবাদকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। প্রাথমিক সময়ে ইসলামী নামধারী গণতান্ত্রিক দলগুলোর ব্যাপারে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অনেকেই এই দলগুলোর বাস্তবতা সম্পর্কে ভুল ধারণায় ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার পর তাদের মুখোশ পুরোপুরিভাবে উন্মোচিত হয়ে যায়। ইখওয়ানের মত দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার পর - এতদিন যারা বাস্তবতা থেকে দূরে ছিল - তাদের কাছেও একদম স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ওরা ইসলামের নামে প্রতারণা করছে। আসলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ধারে কাছেও নেই ওরা। আর প্রকৃতপক্ষে ইসলাম প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হল নববী পদ্ধতি, আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্র নয়। এই ইসলামী নামধারী গণতান্ত্রিক দলগুলো তো তারা যারা ইরাকে ও আফগানিস্তানে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তার মিত্ররা আগ্রাসন চালানোর পর ক্রুসেডারদের সাহায্য করেছিল। এরাই তো তারা যারা শাসন ক্ষমতায় গিয়ে কুফরি সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র শাসন করে, জিহাদকে অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করে, জিহাদকে নিষিদ্ধ করে,

তাদেরই প্রশংসা করে আল-কায়দা। এই এক ইখওয়ান–ইখওয়ানের রিদ্দাহ'র বিষয়টি কি কোন মুওয়াহহিদ মুসলিমের নিকট অস্পষ্ট থাকতে পারে? ইখওয়ান শাসন ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বে ইখওয়ানের ব্যাপারে কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু দল শাসন ক্ষমতায় যাওয়ার পরেও যখন গণতন্ত্র দ্বারা শাসন করে, মিসরী কুফরি আইন দ্বারা শাসন করাকে শারীয়াহ দ্বারা শাসন হিসেবে গণ্য করে, মুওয়াহহিদ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, গণতন্ত্র রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং গণতন্ত্রের পথে চলার আহ্বান করে, সেই দলের রিদ্দাহ'র ব্যাপারে কি কোন মুওয়াহহিদ সন্দেহ করতে পারে?! কিভাবে আল-কায়দা এমন একটি দলের প্রশংসায় মগ্ন থাকে! বিশেষত এক মুরসীর মৃত্যুতে আল-কায়দা কত কি-ই না করল! যার সামান্য পরিমাণ তাওহীদের ইলম আছে তার নিকট মুরসী তাগুত হওয়ার ব্যাপারে কি কোন প্রমাণ অস্পষ্ট থাকতে পারে? যে প্রকাশ্যে বলত চোরের হাত কাটার বিধান কোন অকাট্য বিধান নয় বরং একটি ফিক্বহী ইজতিহাদী মাসআলা, যে বলত মিসরী আইন হচ্ছে শারয়ী আইন, যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং শারীয়াহ বহির্ভূত আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করত এমন এক তাগুতের মৃত্যুতে আল-কায়দা কিভাবে শোক প্রকাশ করে? আল-কায়দার বড় মাপের এক নেতা আবু উবাইদ ইউসুফ আল-আনাবীকে যখন তার ছাত্র মুরসীর প্রশংসা করা জায়েয কিনা–তা জিজ্ঞাসা করেছিল তখন ইউসুফ আল-আনাবী তাকে বলেছিল, "বরং আমরা যদি পারতাম তার পক্ষে প্রতিশোধ নিতাম।" সুবহানাল্লাহ! এটাই কি শাইখ উসামার আল-কায়দা? এই আল -কায়দার প্রতিচ্ছবি আর শাইখ উসামার আল-কায়দার প্রতিচ্ছবি কি এক ছিল? আল্লাহর কসম করে বলছি কখনোই না। হে আল-কায়দার অনুসারীরা! ইসলামের নামে যারা গণতান্ত্রিক রাজনীতি করে তাদের ব্যাপারে শাইখ উসামা رحمه الله কী বলেছেন তা ভালো করে ধারন করে রাখুন! শাইখ বলেন, "এই সকল দাজ্জালদের থেকে সতর্ক করা প্রয়োজন যারা ইসলামী জামাআত ও দলের নামে কথা বলে এবং মানুষকে এই কট্টর রিদ্দায় অংশগ্রহণ করার প্রতি উৎসাহিত করে। যদি তারা সত্যবাদী হত তাহলে দিন-রাতে তাদের একমাত্র চিন্তা হত আল্লাহ তা'আলার জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করা, মুরতাদ সরকার থেকে বারা তথা সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা এবং আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ

করা। যদি তারা অক্ষম হয় তাহলে তারা যেন তাদের অন্তর দ্বারা তা অপছন্দ করে এবং মুরতাদদের প্রোগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণ করা অথবা রিদ্দাহ'র মজলিসে বসা বর্জন করে।"[45] এই ছিল শাইখ উসামার মানহাজ। যাদেরকে শাইখ উসামা দাজ্জাল বলতেন, যাদের থেকে মানুষকে সতর্ক করা প্রয়োজন মনে করতেন আজকের আল-কায়দা তাদেরকে মিত্র বলে ঘোষণা করে। এই তো আল-কায়দার এক শাখার আমীর উসামা মাহমুদ 'দাওয়াতের পদ্ধতি ও জিহাদি মানহাজের হেফাযত' বইতে ইসলামের নামে গণতান্ত্রিক দলগুলোকে তাকফীর করার কারণে খিলাফাহ'র সমালোচনা করার পর বলেছেন,*সেকুলারদের তুলনায় এই দলগুলো হচ্ছে আল-কায়দার মিত্র।* তিনি তার আরেক বই 'ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সমীপে দরদমাখা আহবান তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও' এ*এই সমস্ত দলের নেতা-কর্মীদেরকে 'দ্বীনের রক্ষক' বলে অভিহিত করেছেন।* গেল কিছুদিন পূর্বে যখন তাগুত সাইদী মৃত্যুবরণ করল তখন বাঙ্গালী আল-কায়দা কত কি-ই না করেছে! যে তাগুতী পার্লামেন্টের একজন আইন প্রণেতা ছিল তাকে আল-কায়দা কিভাবে মুসলিম উম্মাহ'র মহান আলেম হিসেবে উল্লেখ করে? সাইদীর লেখা শেষ বই 'নন্দিত জাতির নিন্দিত গন্তব্য' পড়লেই তো তার সর্বশেষ আক্বীদাহ-মানহাজ সম্পর্কে জানা যায়। সে তার পূর্বের চিন্তা-চেতনা থেকে কি একটুও সরেছে? না, সে তার পূর্বের অবস্থাতে অটল ছিল। এরপরেও আল-কায়দা তাকে মহান আলেম বলে প্রচার চালায়। মুজাহিদদের ব্যাপারে এই অঞ্চলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ফাতাওয়া তো সাইদী-ই দিয়েছিল। এই সাইদীর ফাতাওয়াতেই জামাতুল মুজাহিদীনের আমীর শাইখ আব্দুর রহমান رحمه الله সহ কয়েকজনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। এগুলো কি বাঙ্গালী আল-কায়দা জানে না? আসলে জনসমর্থনের পিছনে ছুটে আজ তারা নিজেদের আক্বীদাহ-মানহাজ বিসর্জন দিয়েছে। জিহাদ ও মুজাহিদদের ক্ষেত্রে এই দলগুলোর ভূমিকা সর্বদাই শত্রুতাপূর্ণ ছিল। যখনই কোন ভূমিতে মুজাহিদরা শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দিয়েছে তখন মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ভূমিকা রেখেছে ইসলামের নামে গণতান্ত্রিক দলগুলো। ফিলিস্তিনের গাজা

---

45 আর-রিসালাতুর রবীআহ ইলা আহলিল ইরাকী খাসসাহ ওয়াল-মুসলিমীনা আম্মাহ।

উপত্যকায় মাসজিদে ইবনে তাইমিয়াহ'র মিম্বার থেকে শাইখ ডক্টর আব্দুল লতীফ মুসার নেতৃত্বে জামাআতু জুনদি আনসারিল্লাহ যখন শারীয়াহ বাস্তবায়নের ঘোষণা দেয় তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইহুদীরা করেনি। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল হামাস। সেই মুওয়াহহিদ মুসলিমদের বাড়ি-ঘরে ও মাসজিদে হামাস বোমা হামলা করেছে, আহতদেরকে ধরে হত্যা করেছে এবং কারাগারে বন্দি করে বর্বরোচিত নির্যাতন চালিয়েছে। আমেরিকা ইরাকে হামলা করার পর যখন মুজাহিদরা দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে তখন এই ইখওয়ানপন্থি হিযবুল ইসলামী আমেরিকার সাথে মিলে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। মিসরের সিনাইতে যখন মুজাহিদরা ধারাবাহিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন তখন ডাক্তার যাওয়াহিরীর ভাষ্যমতে মাজলুম নেতা (!) মুরসী নিজে সেনাবাহিনী নিয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। পাকিস্তানে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামও মুজাহিদদের কম ক্ষতি করেনি। তাদের অপকর্মের এতো লম্বা ফিরিস্তি থাকার পরেও আল-কায়দা তাদেরকে দ্বীনের রক্ষক মনে করে!

আল–কায়দার ভাষায় তাওহীদবাদী উম্মাহ জামায়াতে ইসলামী!

ইসলামের লেবাসধারী মুরতাদ গণতান্ত্রিক দলগুলোর এতো এতো অপকর্ম বিদ্যমান থাকার পরেও আল-কায়দার অনুসারীরা তা দেখতে চায় না এবং শুনতেও চায় না। তাই আমি বাঙ্গালী আল-কায়দার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলব, হে বাঙ্গালী আল-কায়দার অনুসারীরা! আপনারা যদি এই অঞ্চলে জামায়াতে ইসলামের অপকর্ম জানতে চান তাহলে জামাআতুল মুজাহিদীনের সদস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করুন–তারাই জামায়াতের অপকর্ম সম্পর্কে আপনাদের বলে দিবে। জামাআতুল মুজাহিদীনের বহু সদস্যদেরকে তাগুতের কাছে ধরিয়ে দিয়েছে আপনাদের মিত্র এই জামায়াত। শাইখ আব্দুর রহমান رحمه الله কে যখন ফাঁসি দেওয়া হয় তখন খুশিতে মিষ্টি বিতরণ করেছে আপনাদের মহান (!) আলেম সাইদীর জামায়াত। আবার আপনারাই এই জামায়াতকে তাওহীদবাদী উম্মাহ বলে প্রচার করেন। কিভাবে এমন দল

তাওহীদবাদী উম্মাহ হতে পারে যারা সর্বদাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে?! যারা ইসলামের নামে গণতান্ত্রিক রাজনীতি করে, তাদের এ কাজ কি কুফর নয়? যারা তাদেরকে তাকফীর করে না তারা তো তাওয়ীলের অজুহাতে তাকফীর করে না। কিন্তু যাদের কাজের মূল হুকুম হচ্ছে কুফর, যাদের সামনে সকল সংশয় নিরসন করা ও বাস্তবতা উন্মোচন করার পরেও যারা এই কুফরের সাথে লেগে থাকে তারা কিভাবে তাওহীদবাদী উম্মাহ হয়? হে আল-কায়দার অনুসারীরা! নাকি আপনাদের নিকট এই সমস্ত দলের কাজের মূল হুকুমই কুফর নয়! যদি তাই হয় তাহলে নিজেদের আক্বীদাহ-মানহাজ আবার নতুন করে পরিশুদ্ধ করুন!

আপনাদের গায়রত কিভাবে আজ এতোটাই নিচে নেমেছে যে, যারা শাসন ক্ষমতায় থাকাকালীন জিহাদ ও মুজাহিদদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে, একটি জিহাদী দলকে প্রায় নিঃশেষ করার পিছনে যাদের মুখ্য ভূমিকা ছিল তারাই নাকি আপনাদের কাছে আজ তাওহীদবাদী উম্মাহ।[46] আপনাদের তো লজ্জা করা উচিৎ, কিভাবে আপনারা শাইখ উসামার মানহাজের উপর রয়েছেন বলে দাবি করেন? শাইখ উসামা যাদেরকে দাজ্জাল বলেছেন, আপনারা আজ তাদেরকে তাওহীদবাদী উম্মাহ বলেন, মিত্র বলে ঘোষণা করেন, দ্বীনের রক্ষক বলে সম্বোধন করেন! ইসলামের নামে যত অপকর্ম আর শিরকী কুফরি কাজ করার পর কেবল ইসলামের নামের কারণে যদি আপনাদের নিকট তা কুফর সাব্যস্ত না হয় তাহলে শাইখ উসামা কেন সাইয়াফ-রব্বানীদের তাকফীর করেছিলেন? তারাও তো ইসলাম ও শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার কথা বলত। কিন্তু তাদের শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার এ দাবি শাইখ উসামার কাছে কোন কাজে আসেনি। বরং আপনারা আজ জনগণের সমর্থন নেওয়ার জন্য যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছেন। তাই তো আপনারা ১৯৭১ এর শিরকী জাতীয়তাবাদী যুদ্ধকে ইসলামের জন্য যুদ্ধ বলে প্রচার করেন।[47] সেনাবাহিনীকে তার পোশাকের মর্যাদা

---

[46] Ummah Network থেকে প্রচারিত 'একজন মাজলুম আলিমে দ্বীনের বিদায়' শিরোনামে ভিডিও

[47] Ummah News থেকে প্রচারিত 'বাংলাদেশঃ ভারতের স্যাটেলাইট স্টেট!' শিরোনামে ভিডিও

রয়েছে বলে প্ররোচিত করেন।[48] আপনারা কোন মানহাজের অনুসরণ করছেন?

ঠুনকো অজুহাতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন না করাঃ

তালেবানের হাত ধরে তালেবানের অনুগত আল-কায়দাও বিচ্যুতির পথে হেটেছে। শাইখ উসামা বিন লাদিন ﷺ এর মৃত্যুর কিছু দিন পর বিচ্যুতির পথে হাটতে শুরু করে আল-কায়দা। যদিও শুরুর দিকে মানহাজগত বিচ্যুতির মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আল-কায়দার কিছু শাখার কর্মকাণ্ডে সুস্পষ্ট কুফরি পরিলক্ষিত হয়। শাইখ উসামা ﷺ জীবিত থাকাকালীন আল-কায়দার যে শাখা কোন ভূমি বিজয় করলে তারা সেখানে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করত, হুদুদ কায়েম থেকে শুরু করে বিচার ব্যবস্থায় শারয়ী বিধিবিধান প্রয়োগ করা, মূর্তি ও শিরকী নিদর্শনগুলো ধ্বংস করা এবং কাফির মুরতাদদের থেকে বারা ঘোষণা করা– এসবগুলো আল-কায়দার বিজিত ভূমিতে একসময় দেখা যেত। এই আনসারুশ শারীয়াহ'কেও আমরা ইয়েমেনে বিজিত ভূমিতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করতে দেখেছি। দেখেছি তাদেরকে মাজার ও উঁচু কবর ধ্বংস করতে, প্রকাশ্যে হুদুদ বাস্তবায়ন করতে, জনসম্মুখে মুরতাদদের হদ বাস্তবায়ন করতে। কিন্তু বর্তমান আল-কায়দা শাইখ উসামার আল-কায়দার নীতির অনুসরণ করে না। তাই তো আমরা দেখি, এই আনসারুশ শারীয়াহ পরবর্তীতে গ্রহণযোগ্য ক্ষমতা না থাকার অজুহাতে বিজিত ভূমিতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকে। জনগণের মাঝে বিরূপ প্রভাব ফেলার অজুহাতে মাজার ও উঁচু কবর ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকে। এমনকি এই সমস্ত মাজারে কার্যক্রম চালানোও নিষিদ্ধ করে না। কেবলমাত্র দাওয়াহ, বাস্তবতা উন্মোচন ও সংশয় দূর করার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। আর তারা নিজেরাই এগুলো বলে বেড়ায়। আমরা দেখেছি, শামে সাহওয়াতরা যখন কোন ভূমি নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তখন তারা না সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে আর না তারা সালাত পরিত্যাগ করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। তারা ইসলামী শারীয়াহ বাদ দিয়ে তাদের মনিব

[48] Ummah News থেকে প্রচারিত 'বাংলাদেশঃ ভারতের স্যাটেলাইট স্টেট!' শিরোনামে ভিডিও

আরব তাগুতদের প্রণয়নকৃত নাগরিক আইন দ্বারা শাসন করছে। তারা আমর বিল মা'রূফ নাহি আনিল মুনকার পরিত্যাগ করেছে। আল-কায়দা এবং তার মিত্র গোষ্ঠীর শ্রদ্ধাভাজন মুহাইসিনী মিডিয়াতে বহুবার বলেছে, *"আমরা ইচ্ছা করলেই সকলে মিলে আইন জারী করতে পারি– যেমন দাড়ি শেইভ করা ও টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ। তাহলে কয়েক দিনের মধ্যেই পুরো চিত্র পাল্টে যাবে। কিন্তু এটা কি ঈমানী সমাজ হবে? এটা হবে একটি নিফাক্বী সমাজ। তারা অপেক্ষা করবে কখন আমরা চলে যাব আর তারা নিফাক্ব করবে।"* সুবহানাল্লাহ্! আমাদের রব আল্লাহ ﷻ এর আদশ কি এটাই? তাদের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা না শারীয়াহ বাস্তবায়ন করছে আর না সৎকাজের আদেশ করছে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করছে!

একই ধরনের কাজ আমরা আল-কায়দার ইয়েমেন শাখাকে করতে দেখেছি। যখন তারা মুকাল্লা শহর দখলে নেয় তখন তারা সেখানে না শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছে আর না আমর বিল মা'রূফ নাহি আনিল মুনকার করেছে। তৎকালীন আল-কায়দার ইয়েমেন শাখার আমীর আবু বাসীর উহাইশী প্রকাশ্যে বলেছে,*"আমাদের হাদারামাউতে বহু মাজার আছে। আল্লাহ-ই জানে সেখানে কত শিরক হচ্ছে। কিন্তু এখন আমাদের করণীয় হল আমরা চেষ্টা করে যাবো বিভিন্ন পোষ্টার, লিফলেট ইত্যাদি সবধরনের দাওয়াতি মাধ্যম ব্যবহার করতে। আমরা এই কাজটি করে যাব। আমাদের আরো কাজ করতে হবে, মূর্তি ভাঙতে হবে, শিরক ধ্বংস করতে হবে, মাজার ভাঙতে হবে আর মাজার ভাঙ্গা ওয়াজিব। যখন আপনি এটা করার সামর্থ্য রাখবেন সুযোগ তৈরি হবে তখন সেটা নিশ্চিহ্ন করবেন। শহর দখল করার মানে এই নয় যে, আপনি তামকীন পেয়ে গেছেন এবং আপনি জনগণের উপর আইন জারী করবেন। আর মানুষ যখন তাদের অধিকার চাইবে তখন বলবেন এটা আমি পারব না।"* সুবহানাল্লাহ্! তাহলে আলী رضي الله عنه কে দেওয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সেই আদেশের বাস্তবায়ন কোথায়? রাসুল ﷺ তো বলেছেন, "হে আলী তুমি কোন মূর্তি ধ্বংস না করে ছাড়বে না এবং কোন উঁচু কবর সমান না করে ছাড়বে না।" একদিকে আল্লাহর রাসুল ﷺ আদেশ করেছেন মূর্তি ভেঙ্গে ফেলতে এবং উঁচু কবর সমান করে

দিতে অপরদিকে তারা করছেটা কী? আমরা আল-কায়দার এই ইয়েমেন শাখাকেই দেখেছি, তারা উঁচু কবর ও মাজার গুড়িয়ে দিত। কিন্তু আজ তাদের শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা কোথায় গেল? বড় বড় শহর দখল করার মত শক্তি তাদের আছে কিন্তু সেই বিজিত শহরে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করার মত শক্তি তাদের নেই। এর চেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে?!

এছাড়াও ২০১২ সালে যখন আল-কায়দা আযওয়াদ অঞ্চলের ভূমি বিজয় করে সেখানে শারীয়াহ কায়েম করে, হুদুদ প্রতিষ্ঠা করে এবং শিরকী নিদর্শন ও উঁচু কবর ভেঙ্গে ফেলে তখন আল-কায়দার বিলাদুল মাগরিব আল-ইসলামীর আমীর আবু মুসআব আব্দুল ওয়াদুদ তাদের জন্য দিক-নির্দেশনামূলক একটি রিসালাহ প্রেরণ করে। তাতে সে বলে, *আযওয়াদ অঞ্চলে তাদের ভুল সিয়াসাত পরিলক্ষিত হয়েছে। আর তা হল, বিজিত অঞ্চলে দ্রুত শারীয়াহ বাস্তবায়ন।* তাই সে তাদেরকে দ্রুত শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা, উঁচু কবর ধ্বংস করা এবং শক্তির মাধ্যমে মুনকার পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকতে আদেশ করে। আর এগুলো করা ছাড়া তাদের বিজিত ভূমিতে যা চলমান থাকে সেটাকে তারা শারীয়াহ বাস্তবায়ন বলে প্রচার করতে থাকে। বরং যে সকল মুওয়াহহিদ মুসলিমরা অধিকৃত ভূমিতে পরিপূর্ণ শারীয়াহ বাস্তবায়ন করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করে। এক্ষেত্রে আরো নিকৃষ্ট যে কাজটি তারা করে তা হল, যে দলগুলোকে তারা পূর্বে মুরতাদ মনে করত সেই দলগুলোর সাথে তারা জোটবদ্ধ হয়ে মুওয়াহহিদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তারা এই ধরনের কাজ শামে করেছে, লিবিয়াতে করেছে, ইয়েমেনে করেছে, মালিতে করেছে। যারা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা জাহিলী পৌত্তলিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে তাদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে তারা লড়াই করে। পাশাপাশি সেই মুরতাদদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে তারা মুওয়াহহিদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যারা তাদের অধিকৃত ভূমিতে পরিপূর্ণরূপে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করে।

আল–কায়দা এবং রাফিদীঃ

আল-কায়দার অবস্থা আজ এতোটাই নিচে নেমেছে যে, মুশরিক রাফিদীদের হত্যা করলে আল-কায়দা বিবৃতি প্রকাশ করে নিন্দা জানায়। যে স্থানগুলোতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা দেওয়া হয়, যে স্থানগুলোকে স্বয়ং মুশরিকরা মাসজিদ নামে আখ্যায়িত করে না আল-কায়দা ঐ শিরকী স্থানগুলোকে মাসজিদ হিসেবে উল্লেখ করে। অথচ মাসজিদ তো হল যেখানে আল্লাহর জন্য সিজদা করা হয়। যে রাফিদী মুশরিকদের তাকফীরের ব্যাপারে আলেমগণের ইজমা রয়েছে সেই মুশরিকদের হত্যা করার কারণে আল-কায়দা দাওলাতুল ইসলামের নিন্দা করে। অথচ এই আল -কায়দাই শাইখ উসামা رحمه الله এর সময় মুশরিক রাফিদীদের উপর গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটাতো। তানযীম আল-কায়দারই অন্যতম একজন শাইখ আবু সুফিয়ান সাইদ আশ-শেহরী رحمه الله ইরাকে আমভাবে মুশরিক রাফিদীদের হত্যা করার কারণে আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী رحمه الله এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু বর্তমান আল-কায়দা আজ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এক ডাক্তার যাওয়াহিরী ব্যতীত আর কে রাফিদীদের হত্যা করাতে আনন্দিত হত না? আর কে রাফিদীদেরকে পৌত্তলিক মুশরিক বলে আখ্যায়িত করত না?

আল-কায়দার শারয়ী বিভাগের প্রধান ছিলেন শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিব্বী رحمه الله - তিনি আলে সালুল কর্তৃক এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রেক্ষিতে দেওয়া বক্তব্যে বলেন, “এমনকি মুশরিক রাফিদীরা–সম্প্রতিকালে যাদেরকে তাকফীর করার ব্যাপারে, যাদের রহস্য উন্মোচন করার ব্যাপারে এবং যাদের শিরক বর্ণনা করার ব্যাপারে ফাতাওয়ার পর ফাতাওয়া প্রকাশ হত তারাই নাকি আজ অনুমোদিত আক্বীদাহ সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে গেছে, এমন সম্মেলনে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করার সহিত যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সকল ধর্মের মাঝে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের জন্য। তাহলে মুশরিক রাফিদীরা কি হিদায়াত পেয়ে গেছে নাকি তোমরা পথভ্রষ্ট হয়েছো হে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের আহ্বানকারীরা এবং তাদের সহযোগীরা?... ঐ দ্বীন কতই না নিকৃষ্ট যা আহলুস সুন্নাহ’র তাওহীদ ও রাফিদীদের শিরকের মাঝে সমন্বয় সাধন করে এবং এর অধীনে সম্মানিত সাহাবীগণের বিরোধিতাকারীদের,

তাদেরকে লা'নত ও তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের মাধ্যমে অপবাদ আরোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে। আবার এই নিকৃষ্ট দ্বীনে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয় উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা رضي الله عنها থেকে দায়মুক্ত ঘোষণাকারীরা, তাকে অপবাদ আরোপকারীরা ও তার ব্যাপারে মিথ্যা রটনাকারীরা।”[49]

আর শাইখ হামদ আল-হুমাইদী–তাগুত আলে সালুল কর্তৃক তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর আল-কায়দার ইয়েমেন শাখার মালাহিম মিডিয়া থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে তাকে নক্ষত্র হিসেবে ভূষিত করা হয়েছিল, তিনি রাফিদীদের ব্যাপারে বলতে গিয়ে শাইখ ইবনে আব্দুল লতীফ رحمه الله এর উক্তি উল্লেখ করার পর বলেন, “সেটা ছিল তার সময়ের কথা, যদি তিনি এই যুগে মক্কা, মদিনা, বাকী কবরস্থান ও অন্যান্য জায়গায় তাদের শিরকের দৃশ্য দেখতেন তাহলে কেমন হত? সুতরাং তাদের পুরুষ, নারী, সাধারণ জনগণ এবং আলেম সবাই কাফির।”[50]

কিছু কিছু ব্যক্তি কয়েকশ বছর পূর্বে সাধারণ রাফিদীদের ব্যাপারে কতিপয় আলেমগণের দেওয়া ফাতাওয়া নিয়ে এসে বর্তমান সময়ের সাধারণ রাফিদীদের ব্যাপারে প্রয়োগ করে–তাদের জবাবে আল-কায়দারই একটি শাখার আমীর ক্রুশ চূর্ণকারী শাইখ আবু মুসআব আয-যারকাওয়ী رحمه الله বলেছেন, “সাধারণ রাফিদীরা সাধারণ আহলুস সুন্নাহ'র মতো–এ উক্তি করা -আল্লাহর কসম- কেবলই সাধারণ আহলুস সুন্নাহ'র প্রতি জুলুম। আহলুস সুন্নাহ'র মধ্যে তাওহীদের যে মূলনীতি রয়েছে তা এবং রাফিদীদের মধ্যে হুসাইন ও আলে বাইতের নিকট সাহায্য চাওয়ার যে মূলনীতি রয়েছে এ দু'টি কি সমান! কারবালায় এবং অন্যান্য স্থানে তাদের কর্ম তো কোন দূরদর্শী ব্যক্তির নিকট গোপন নয়। তাদের আক্বীদাহ'র মধ্যে রয়েছে–তাদের ইমামদেরকে নিষ্পাপ মনে করা এবং ইলমুল গায়েব ও পৃথিবীতে হস্তক্ষেপ করার বিষয় তাদের দিকে নিসবত করা। এছাড়াও আরো বহু শিরক রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে কোন ব্যক্তির অজ্ঞতার উজর গ্রহণযোগ্য হয় না।

---

49 আত-তাক্বারুবু বাইনাল আদইয়ান

50 আক্বওয়ালু আহলিল ইসলাম ফীল হুকমি আলার রাফীদাহ

আহলুস সুন্নাহ'র মধ্যে নাবী ﷺ এর সাহাবীগণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার যে মূলনীতি রয়েছে তা এবং রাফিদীদের মধ্যে সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষের যে মূলনীতি রয়েছে, এমনকি তাদেরকে লা'নত করা যাদের মূলে রয়েছে নাবী ﷺ এর দুই সাহাবী আবু বকর ও ওমার, আয়িশা সিদ্দীকা رضي الله عنها কে ফাহেশার অপবাদ দেওয়া– এ দু'টি কি সমান! আল্লাহর কসম এই দু'টি সমান নয়।

আল্লাহর কসম এ দু'টি সমান নয় এবং কখনোই এ দু'টি এক হবে না
যতক্ষণ না কাকের সিঁথি শুভ্র হয়

অতঃপর ইরাকে রাফিদীদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই জানে যে, তারা সাধারণ নয় যে অর্থে আপনি উদ্দেশ্য করেন। বরং তারা দখলদার কাফিরের সৈনিকে পরিণত হয়েছে এবং সত্যবাদী মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে গুপ্তচরে পরিণত হয়েছে। জা'ফরী, হাকীম এবং অন্যান্য রাফিদীরা কি এই সমস্ত লোকদের ভোট ছাড়াই শাসন ক্ষমতায় পৌঁছেছে?! ইবনে তাইমিয়াহ'র যুগে তার দেওয়া ফাতাওয়া নিয়ে এসে বর্তমান সময়ের রাফিদীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাটা কেবলই জুলুম–দুই যুগের রাফিদীদের মাঝে অনেক পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে। আলেমগণের একটি অংশ নির্দিষ্টভাবে সকল রাফিদীদের কুফরির কথা বলেছেন। যেমন- শাইখ হামুদ বিন উকলা, শাইখ সুলাইমান আল-উলওয়ান, শাইখ আলী আল-খুদাইর, শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আল-মুহাজির, শাইখ আব্দুল্লাহ আর-রশূদ।"[51]

এই আল-কায়দা পূর্বে রাফিদীদের হুসাইনিয়্যাতকে হুসাইনিয়্যাত নামে আখ্যায়িত করত। কিন্তু আজ এই আল-কায়দার কী হল যে, তারা রাফিদীদের হুসাইনিয়্যাতগুলোকে মাসজিদ নামে আখ্যায়িত করে। হে আল-কায়দার অনুসারীরা! দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকরা যখন মুশরিক রাফিদীদের উপর বিস্ফোরণ ঘটায় তখন আপনাদের নেতারা এর নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেয় এবং প্রচার করতে থাকে যে, এ কাজ বৈধ নয়। আর আপনারাও নেতাদের অনুসরণ করে রাফিদীদের হত্যাকে না জায়েয মনে করেন। রাফিদীদের উপর গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটানো তো

51 বায়ানুন ওয়া তাওদ্বীহুন লিমা আছারাহুল মাক্বদিসী ফী লিক্বাইহী মাআ ক্বনাতি আল-জাযিরাহ

শাইখ উসামার আল-কায়দারই সুন্নাহ। আবু মুসআব থেকে শুরু করে আবু সুফিয়ান সাইদ আশ-শেহরী–সবাই তো রাফিদীদেরকে বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি দিয়ে হত্যা করত। বিস্ফোরক দিয়ে রাফিদীদের হত্যা করার সুন্নাহ তো দাওলাহ-ই প্রথম শুরু করেনি। এই সুন্নাহ তো যারক্বাওয়ীর সুন্নাহ, এই সুন্নাহ শাইখ উসামার সুন্নাহ। রাফিদীদেরকে আমভাবে হত্যা করা শাইখ উসামার জীবদ্দশায় প্রথমে শুরু করেছিলো ইরাকের আল-কায়দা। ইরাকের ভূমিতে যতদিন আল-কায়দার অস্তিত্ব ছিল ততদিন আল-কায়দার আমীর-সৈনিক সকলেই রাফিদীদেরকে ব্যাপকভাবে লক্ষ্যবস্তু বানাতো। আর এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন শাইখ আবু মুসআব আয-যারকাওয়ী رحمه الله - এই শতাব্দীতে তিনিই রাফিদীদেরকে আগ্রাসী শত্রু আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। রাফিদীদের বিরুদ্ধে শাইখের এই যুদ্ধ পৃথিবীর আনাচেকানাচে সকল মুসলিম ও মুজাহিদদের অন্তর প্রশান্ত করেছিল। রাফিদীদের বিরুদ্ধে শাইখের এই বরকতময় অভিযানের ব্যাপারে আল-কায়দারই আরেক মহান শাইখ আবু সুফিয়ান সাইদ আশ-শেহরী رحمه الله বলেন, “রাফিদীরা আমাদের আহলুস সুন্নাহ’র ভাইদের রক্ত ঝরিয়ে এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সুন্নী মাসজিদগুলো দখল করে সেগুলোকে পৌত্তলিক রাফিদী মাসজিদ ও হুসাইনিয়্যাতে রূপান্তরিত করে আনন্দন পায়–যেগুলোতে তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য চায়। তথাপি এসব সত্ত্বেও আল্লাহর কসম আমরা জানি যে, রাফিদীরা উঁৎপেতে থাকা এক শত্রুর মত। আল্লাহ আবু মুসআব আয-যারকাওয়ীর উপর রহম করুন, যার মাধ্যমে আল্লাহ ইরাকের আহলুস সুন্নাহ’কে সম্মানিত করেছেন। তিনি রাফিদীদের সাথে কী করেছিলেন যখন তিনি নিরস্ত্র আহলুস সুন্নাহ’র বিরুদ্ধে রাফিদীদের বিস্তৃত অনিষ্টতা ও গুরুতর বিপদ দেখেছিলেন। এবং কিভাবে আল্লাহ তা’আলা আমাদের বীরপুরুষদের দম্ভের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি প্রতিরোধ করেছিলেন –যারা আল্লাহর প্রতি অগ্রসর হয়ে পিছু না হটে বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ির বিনিময়ে দুনিয়াকে বিক্রি করে দিয়েছে এবং দুনিয়ার চাকচিক্যকে তালাক্ব দিয়েছে, এই গাড়িগুলো রাফিদীদের রাতকে দিনে পরিণত করেছে। সুতরাং হে আবু মুসআব আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনিই পাপিষ্ঠ রাফিদীদের ক্ষতি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এক বরকতময় সুন্নাহ রেখে গেছেন।”

এই হল শাইখ আবু সুফিয়ান সাইদ আশ-শেহরীর বক্তব্য। এরপরেও যদি আপনারা মনে করেন, বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি দিয়ে রাফিদীদেরকে আমভাবে হত্যা করা দাওলাহ শুরু করেছে তাহলে আমরা বলি, আপনারা আপনাদের নেতাদের জিজ্ঞাসা করুন, ইয়েমেনে বদরুদ্দীন হুথীর জানাযায় কে গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল? এক বিস্ফোরণে ১৪২ জন নিহত এবং কয়েকশ আহত হয়েছিল। আমরাই আপনাদের বলছি, ১৪৩১ হিজরীর যুল-হাজ্জ মাসে আমীন উসমানী ﵀ বদরুদ্দীন হুথীর জানাযায় বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি দিয়ে রাফিদীদের উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই হামলায় ভাই শহীদ হন (আমরা তার ব্যাপারে এমনটাই মনে করি আর আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী) এবং ১৪২ জন নিহত ও কয়েকশ আহত হয়। আর এই পুরো অভিযানের ভিডিও 'মালাহিম' মিডিয়া থেকে 'নুসিরতুম ইয়া আহলাস সুন্নাহ' শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শুধু কি হামলা করাতেই সীমাবদ্ধ ছিল? ১৪৩১ হিজরীর ১৯ ই যুল-হাজ্জ মাসে রোজ বৃহস্পতিবার আল-কায়দার ইয়েমেন শাখা একটি বিবৃতি প্রকাশ করে, তাতে আহলুস সুন্নাহ'র সন্তানদেরকে আহ্বান করা হয় তারা যেন নাবী ﷺ এর সম্মান রক্ষার ব্যাটেলিয়নে যোগদান করে। সেই বিবৃতিতে বলা হয় শিয়া বিপদ অত্যাসন্ন। এই বিবৃতির শেষের দিকে বলা হয়ঃ "আহলুস সুন্নাহ যেন জেনে রাখে, রাফিদী হুথীদের লক্ষ্যবস্তু বানানো আমাদের জন্য একটি শারয়ীসিদ্ধ বিষয়। তাই আমরা আমাদের আহলুস সুন্নাহ'র ভাইদের সতর্ক করছি তারা যেন রাফিদী হুথীদের সমাবেশ ও কাফেলাগুলো বর্জন করে। আমরা তাদের মাধ্যমে প্রতারিত ব্যক্তিদের আহ্বান করছি, সময় ফুরিয়ে যাবার আগে তারা যেন রাফিদী হুথীদের পরিত্যাগ করে। আমরা রাফিদী হুথীদের জন্য এমন বীর পুরুষ প্রস্তুত করে রেখেছি যাদের মন কখনোই শান্ত হবে না যতক্ষণ না তারা রাফিদী হুথীদের অপবিত্রতা থেকে এবং আহলুস সুন্নাহ'র বিরুদ্ধে তাদের অপরাধ থেকে যমীনকে পবিত্র করে। তারা শান্ত হবে না যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।" রাফিদীদের ব্যাপারে এই ছিল শাইখ উসামার মানহাজ, এটাই ছিল শাইখ উসামার আল-কায়দা। কিন্তু আজ আল-কায়দা এ কী করছে?! রাফিদীদের যখন হত্যা করা হয় তখন আল-কায়দা জানায় নিন্দা আর আল-কায়দার উমারা তালেবান নেয় প্রতিশোধ। এরপরেও কি কেউ বলবে আল-

কায়দা তার পূর্বের মানহাজ পরিবর্তন করেনি?

যাওয়াহিরীর পরিবর্তিত এই আল–কায়দার মানহাজের দিকেই কি আহ্বান করেছিলেন শাইখ উসামা رحمه الله ?

শাইখ উসামা رحمه الله কি এই মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন যে, তার হাতে গড়া সংগঠন আল-কায়দা বা অন্য মুজাহিদগণকে আফগান থেকে বের করে দেওয়া বা নির্মূল করার ব্যাপারে আমেরিকার সাথে চুক্তি করা হবে। শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله কি এই মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন যে, ইরাক, শাম, ইয়েমেন, ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা এবং তাদের দালালরা দখলদারিত্ব চালিয়ে যাবে, নির্যাতন-নিপীড়ন অব্যাহত রাখবে আর আমেরিকা ও তার দোসরদের সাথে শান্তিচুক্তি করা হবে? শাইখ رحمه الله কি এই মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন যে, আমাদের বোন ড. আফিয়া সিদ্দীকাসহ হাজার হাজার মুসলিম ভাই-বোন আমেরিকা ও তার দোসরদের কারাগারগুলোতে নির্যাতিত হতে থাকবে আর তালেবান আমেরিকার নিরাপত্তা বিধান করেই যাবে এবং যারা আমেরিকার ত্রাস বা হুমকির কারণ হবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? শাইখ رحمه الله কি আফগানিস্তানের অধিবাসী হওয়ার ভিত্তিতে ওয়ালা করার মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন? শাইখ কি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতীক স্বাধীনতা সৌধে ফুল দেওয়ার মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন? শাইখ উসামা رحمه الله কি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ বা জাতীয়তাবাদী দলগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন? শাইখ কি এই মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন যে, উইঘুরে মুসলিমগণ নির্যাতিত নিষ্পেষিত হতে থাকার পরেও চীনের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা হবে? ধিক্কার জানাই শত ধিক্কার জানাই লাঞ্ছিত অপদস্থ এই তালেবানকে! আল্লাহর কসম! ফিলিস্তিনে মুসলিমগণ এখনো নির্যাতিত নিপীড়িত বরং বিগত দিনগুলো থেকে ক্রমান্বয়ে তা বেড়েই চলেছে। এ সত্ত্বেও আমেরিকা নিরাপত্তা পায় তালেবানের কাছে!! এটাই কি চাওয়া পাওয়া ছিল

শাইখ উসামার!! আহ আফসোস! তিনি চেয়েছিলেন কী আর এখন তালেবান এবং শাইখের কথিত উত্তরসূরীরা করছেটা কী?

তিনি চেয়েছিলেন পৃথিবীর সব জায়গাতেই কুফফারদের জন্য ত্রাসের সৃষ্টি করা হবে। বর্তমানে দাওলাতুল ইসলাম ছাড়া অন্য কেউ কি আমেরিকা ও তার দোসরসহ সকল কুফফারদের বিরুদ্ধে ত্রাসের সঞ্চার করছে? প্রিয় পাঠক! সকল কুফফার কি জাযিরাতুল আরব থেকে বের হয়ে গেছে? সকল কুফফার কি মুহাম্মাদ ﷺ এর উপদ্বীপ থেকে বের হয়ে গেছে? তাহলে আমেরিকা কী কারণে নিরাপত্তা পেল তালেবানের পক্ষ থেকে? কী সেই কারণ? এখানে বদলে গেছে কে? আমেরিকা নাকি তালেবান? আমেরিকা ও তার দোসরদের সাথে তালেবানের রিদ্দামূলক গর্হিত এই শান্তিচুক্তিকে কিভাবে এই প্রজন্মের আল-কায়দা ফাতহে মুবীন বলতে পারে? ফাতহে মুবীন কি এটাই যে, আমেরিকা আফগান ছেড়ে চলে গেছে? তাহলে শাইখ উসামা رحمه الله টুইনটাওয়ারে হামলা চালিয়েছেন কেন? তখন তো আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলা চালায়নি, তবে কেন শাইখ এই হামলা পরিচালনা করলেন? শাইখ চেয়েছিলেন আমেরিকাকে যুদ্ধের ময়দানে টেনে আনতে যাতে আমেরিকার পরিচালিত কুফরি বিশ্ব ব্যবস্থা ধ্বংস করতে পারেন। আমেরিকার পরিচালিত বিশ্ব ব্যবস্থা তো এখনো ধ্বংস হয়নি। তাহলে কোথায় ফাতহে মুবীন? আমেরিকা চাইছিলো যেন আফগানিস্তান থেকে বিশ্বব্যাপী কোন জিহাদের কার্যক্রম চলতে না পারে। তালেবান যেন আগের মত কোন মুহাজিরকে আফগানিস্তানে ঠাঁই না দেয়—যারা আমেরিকা ও তার মিত্রদের জন্য হুমকি হতে পারে। আর তালেবান সেই সুযোগটাই করে দিল—এই মানহাজের দিকেই কি শাইখ উসামা رحمه الله আহ্বান করেছিলেন? তিনি তার জীবনভর মুসলিমদের ভূমিগুলো থেকে দখলদার কুফফার এবং কুফফারদের এজেন্ট মুরতাদ শাসকদের উৎখাত করা এবং পুরো পৃথিবীতে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। মুসলিমরা নিরাপদ না হলে কুফফাররা কোথাও নিরাপত্তা পাবে না। শাইখের এ কথারই বাস্তবায়ন করে চলেছে তার প্রকৃত উত্তরসূরী দাওলাতুল ইসলামের আমীর-উমারা এবং এর সন্তানগণ—আলহামদুলিল্লাহ।

শাইখ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদিন رحمه الله এর ইচ্ছা ছিল আমেরিকা ও তার অধিবাসীরা নিরাপত্তার স্বপ্নও দেখতে পারবে না। বর্তমানে শুধুমাত্র দাওলাতুল ইসলামই আমেরিকা এবং সকল কুফফারদের নিরাপত্তাকে ত্রাসে পরিণত করেছে। ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়াসহ পুরো পৃথিবীজুড়েই খিলাফাহ'র সিংহরা কুফফারদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে–যে ব্যাপারে শত্রু-মিত্র সবারই জানা আছে। এভাবেই দাওলাতুল খিলাফাহ শাইখের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে যাচ্ছে। যদিও ডাক্তার সাহেবের আল-কায়দা কুফফারদের দোরগোড়ায় সংঘটিত হামলাগুলো নিয়ে সমালোচনা করেছে। তাদের সমালোচনার কারণ ছিল, এগুলোর মাধ্যমে রাজনৈতিক কোন ফলাফল অর্জন হয়নি। তাদের দাবি হল- বেসামরিক আমেরিকানদের হত্যা করাটা তেমন কোন ফায়দাজনক কাজ না। আসলে শাইখ উসামা رحمه الله আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন বেসামরিক কুফফারদের হত্যার মাধ্যমে। 'নাইনইলেভেন' এর বরকতময় হামলায় কয়েক হাজার আমেরিকার বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। আর শাইখ উসামা رحمه الله এর ইচ্ছা ছিল আমেরিকা ও তার অধিবাসী অর্থাৎ আমেরিকার সামরিক এবং বেসামরিক কেউ যেন নিরাপত্তার স্বপ্ন দেখতে না পারে। শুধু সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করা হবে এবং বেসামরিক সবাই নিরাপদে থাকবে এমনটা শাইখের ইচ্ছা ছিল না। এটা তার বক্তব্য দ্বারাই একেবারে স্পষ্ট। আর দাওলাতুল ইসলামও সে কাজটা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে দাওলাতুল ইসলামই ইরাক, শাম, খোরাসান, লিবিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা, সোমালিয়া এবং ফিলিপিনের ফ্রন্টগুলোতে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়ে গেছে এবং ফ্রন্ট লাইন ছাড়াও আমেরিকাসহ সকল কুফফারদের নিজ দেশে তাদেরকে বিভীষিকাময় মৃত্যু উপহার দিয়ে যাচ্ছে। শাইখ উসামা رحمه الله ও চেয়েছিলেন যুদ্ধের জ্বলন্ত শিখা যেন তাদের দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এব্যাপারে শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিব্বী رحمه الله বলেন, "পশ্চিমারা সর্বদা চায়, তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আমাদের দেশে অবস্থান করে। এর দ্বারা বুঝা যায়, এই যুদ্ধের ঘ্রাণ যদি তাদের দেশে পৌঁছে, তাহলে তাদের কি অবস্থা হতে পারে!

পশ্চিমারা দুটি পয়েন্টে কাজ করেঃ

- প্রথমত, আমাদের দেশগুলিতে এবং আমাদের ইসলামিক ভূমিগুলির অভ্যন্তরে সামরিক ক্রিয়াকলাপে আমাদেরকে ব্যস্ত রাখা। এমনকি এই সামরিক ক্রিয়াকলাপ পশ্চিমাদের বাহিনী বা এজেন্টদের বাহিনীর বিরুদ্ধে হলেও।

- দ্বিতীয়ত, পশ্চিমারা তাদের জনগনের সামনে তাদের ও তাদের দেশগুলিকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ হিসাবে দেখাতে চায়। তারা (নিজদের) দেশগুলিকে নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করে রাখতে চায়।

- সুতরাং আমাদের এই দূষিত রাজনীতিটিকে সফল হতে দেওয়া উচিত হবে না। তাই যুদ্ধ তাদের দেশগুলির গভীরে স্থানান্তরিত করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এমনকি নিয়মিত বিরতিতে বিক্ষিপ্ত অপারেশন আকারে হলেও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

তাদের দেশে একটি শক্তিশালী এবং নিখুত অপারেশন, আমাদের দেশে তাদের বাহিনী বা তাদের এজেন্টদের বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েক ডজন অপারেশনের সমান।

আমাদের উচিত নয় যে, সমস্ত কাজকর্মে ফুটবল মাঠের ডিফেন্ডারের মত সীমান্তে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে সীমাবদ্ধ থাকব (ফুটবল মাঠের ডিফেন্ডারের মূল কাজ হচ্ছে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় বিশেষ করে স্ট্রাইকারকে থামানো, গোল করা থেকে বিরত রাখা) আর আমদের শত্রুরা পুরো ময়দানকে তাদের বিচরণক্ষেত্র বানিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে।

﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

"অতঃপর তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"

এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল-কায়দার সাথে যুক্ত সকলে যেন পশ্চিমা দেশগুলিতে, বিশেষত আমেরিকার অভ্যন্তরে সামরিক বা দুর্বিষহকারী অপারেশন

চালানোর জন্য চেষ্টা করে। তবে এক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো বা অস্থিরতার প্রয়োজন নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল - সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পদক্ষেপগুলিকে মজবুত করা। তারপরে সফল বাস্তবায়ন। আল্লাহ-ই বিশ্বস্তদের অভিভাবক।”[52]

এর বিপরীতে আল-কায়দার আমীর ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরী শাইখ উসামা ﷺ আমেরিকা ও অন্যান্য কুফফারদের জন্য ফাঁদ স্বরূপ যে ফ্রন্টগুলো বিস্তৃত করেছিলেন সেগুলোকে তিনি অনেকটাই গুঁটিয়ে ফেলেছেন বিভিন্ন মাসলাহার অজুহাতে। যে ফাঁদ শাইখ উসামা পেতেছিলেন কাফিরদের জন্য তা ডাক্তার সাহেব নষ্ট করে দিলেন। আল-কায়দার খোরাসান শাখা বিলুপ্তির মাধ্যমে আমেরিকাকে আঘাত করার বড় সুযোগটি নষ্ট করে ফেললেন। সংগঠনের নিজস্ব অবকাঠামো না থাকলে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে কাজ করা যায় না। আর এভাবেই তিনি শাইখ উসামা বিন লাদিন ﷺ এর ইচ্ছাকে পায়ে ঠেলে দিলেন।

এই শতকে উম্মাহ’র পূনর্জাগরণকারী শাইখ উসামা ﷺ

সম্মানিত ভাইয়েরা আমার! শাইখ উসামা ﷺ ছিলেন এই শতকে উম্মাহ’র পুনর্জাগরণকারী। তিনি ছিলেন একজন মহান অগ্রপথিক। তিনি কুফফার মুরতাদদের বিরুদ্ধে জবান এবং তরবারি দ্বারা জিহাদ চালিয়ে গেছেন। তিনি উম্মাতে মুসলিমাকে নির্যাতন নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে নিজের আয়েশী জীবন ত্যাগ করেছিলেন। তার মত উম্মাহ’র মহান বীর সেনানীর কীর্তি এই স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আজ আমরা ডাক্তার সাহেবকে দেখি, তিনি শাইখ উসামা ﷺ এর পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তো দূরের কথা বরং সেগুলোকে নষ্ট করছে। নষ্ট করেছে তিলেতিলে গড়ে তোলা শাইখ উসামা ﷺ এর আল-কায়দার চিন্তা-চেতনাকে। আল-কায়দার মানহাজকে কলুষিত করেছে বৈপ্লবিক চিন্তা-ধারায় পরিবর্তিত করার মাধ্যমে।

52 বিক্ষিপ্ত ভাবনাঃ পৃষ্ঠা ১৪-১৫

ডাক্তারের কথিত হিকমতের কারণেই আল-কায়দার দুইটি ফ্রন্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তারই অদূরদর্শিতার কারণে উম্মাহ'র মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে। ডাক্তার সাহেব হিকমতের নাম দিয়ে কত কী-ই না করেছে!! আর হ্যাঁ, তাওহীদবাদী মুজাহিদগণই পশ্চিমা সভ্যতার মূলে আঘাত করতে নাইনইলেভেন ঘটিয়েছিলেন। আর সর্বোত্তম পূর্বসূরির সর্বোত্তম উত্তরসূরিরাই ব্রাসেলসে পশ্চিমাদের আঘাত করেছেন, লাসভেগাসে আমেরিকাকে হতবিহ্বল করে দিয়েছেন। নাইনইলেভেনে হামলার মুওয়াহহিদগণের উত্তরসূরী তো তারা নয় যাদের সর্বোচ্চ নেতারা পশ্চিমা পোশাকে সজ্জিত নারীদের সাথে বিলাসবহুল হোটেলে বসে আলাপচারিতা করে। মুজাহিদরা তো সেই উসামার উত্তরসূরী যিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷫ এর মত উম্মাহ'কে তাওহীদ শিখিয়েছেন। চিনিয়ে দিয়েছেন কে শত্রু আর কে মিত্র। শিক্ষা দিয়েছিলেন আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র মত মহান আক্বীদাহ। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ আক্বীদাহ-মানহাজের অধিকারী, কাফির ও কুফরের ব্যাপারে আপোষহীন এক মহান অগ্রনায়ক। শাইখ উসামা ﷫ এই শতকে উম্মাহ'কে শিখিয়েছেন আল্লাহর যমীনে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র উপায় হল জিহাদ ও ক্বিতাল। তিনি ইসলামী লেবাসধারী কাফিরদের ব্যাপারে গোলোক ধাঁধায় ছিলেন না। তিনি জানতেন ইসলামের নাম বলে বেড়ানো এই সকল শাসকরা ইসলামের কোনই উপকার করবে না। পক্ষান্তরে এরাই মুসলিমদেরকে কাফিরদের গোলামে পরিণত করেছে। তাই তিনি তাদের থেকে মুসলিম উম্মাহ'কে সর্বদাই সতর্ক করতেন। আজ দাওলাতুল ইসলাম শাইখ উসামা বিন লাদিন ﷫ এর মানহাজের উপর চলছে। তাই আপনি এ দাওলাহ'কে দেখবেন না কোন কাফিরের চাটুকারিতা করতে–হোক সেটা আসলী কাফির অথবা মুরতাদ কাফির। শাইখ উসামা যেমন পশ্চিমাসহ সকল কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন ঠিক একইভাবে দাওলাহ আজ কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করছে। শাইখ উসামা কাফিরদের সাথে যে কর্মপদ্ধতি ব্যবহার করতেন দাওলাহ কাফিরদের সাথে আজ একই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করছে। তাই আল্লাহর অনুগ্রহে দিনকে দিন দাওলাহ বিস্তৃত হচ্ছে ঠিক যেমন শাইখ উসামা ﷫ এর জীবদ্দশায় আল-কায়দা বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরীর হিকমার স্রোতে আজ আল-কায়দা সংকুচিত হচ্ছে। লিবিয়ার আল-

কায়দা আজ হাকীমের হিকমার কারণে বিলুপ্ত, তিউনিসিয়ায় ইসলামী দাবিদার সরকার দলের প্রতি ডাক্তার সাহেবের গোলোক ধাঁধার কারণে সেখানে আল-কায়দা নিশ্চিহ্ন, সবশেষে তার হিকমার কল্যাণে শামে নিজেরা একে অপরের সাথে মারামারি করে আজ বিলুপ্তির পথে–আল্লাহ এদের হিদায়াত দান করুন নতুবা এদের বিলুপ্তি তরান্বিত করুন আমীন!

বিবর্তিত এই আল–কায়দার অন্যতম এবং প্রধান রূপকার হলেন সাফীহুল উম্মাহ আইমান আয–যাওয়াহিরী!

শাইখ উসামা ﷺ ২০১১ সালের মে মাসে আমেরিকার হামলায় শাহাদাত বরণ করার পর থেকে তানযীম আল-কায়দার নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন আইমান আয -যাওয়াহিরী। মিসরে থাকাকালীন এক সময় তিনি ইখওয়ানের সাথে যুক্ত ছিলেন। তানযীম আল-কায়দার প্রধান ব্যক্তিত্ব হওয়ার পর থেকেই আল-কায়দার মত হক্বপন্থি জিহাদী দলকে বৈপ্লবিক দলে রূপান্তরিত করার চেষ্টা শুরু করে দেন। এক সময় তিনি আল-কায়দার মৌলিক চিন্তা-চেতনাকে বদলে ফেলে ভিন্ন চেহারায় রূপ দেন। বদলে ফেলেন পূর্বের আল-কায়দার আক্বীদাহ-মানহাজও। আমাদের মহান শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী ﷺ তাকে একদম উপযুক্ত উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন, কারণ ডাক্তার যাওয়াহিরীর সাফাহাতের অন্তর্ভুক্ত কি এটা নয় যে, একটি স্বাধীন দাওলাহ তথা রাষ্ট্রকে নিজের অধীনস্থ ঘোষণা করা, অথচ ডাক্তার যাওয়াহিরী নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, *“দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ, ইমারাতে আফগানিস্তান আল-ইসলামিয়্যাহ এবং আমি এই দু’টির সাথে ক্বাওকাযের ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ’কে যুক্ত করছি–এই ইসলামী ইমারাতগুলো একজন শাসকের অধীনস্থ নয়। আশা করা যাচ্ছে অতি দ্রুতই খিলাফাহ’র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে যে রাষ্ট্র এই তিন ইমারাহ’কে এবং সকল মুসলিমদেরকে একত্রিত করবে।* ”[53] ডাক্তার যাওয়াহিরী একই সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

[53] লিক্বা আল-মাফতূহঃ আল-হালাক্বাতুস সানিয়াহ

"মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার (হাফিঃ) হলেন আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ'র আমীর। আর মুজাহিদদের মধ্য থেকে যে এই ইমারাতের সাথে যুক্ত হয় সে এবং শাইখ উসামা বিন লাদিন (হাফিঃ) মোল্লা ওমারের একজন সৈনিক।"[54] ডাক্তার যাওয়াহিরীর বক্তব্য থেকে যা স্পষ্ট হয় তা হল - তিনটি ইসলামী ইমারাত রয়েছে, যেগুলো কোন একজন শাসকের অধীনস্থ নয়। আর শাইখ উসামা ﷺ মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার ﷺ এর একজন সৈনিক। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, না মোল্লা ওমার এবং না শাইখ উসামা দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র আমীর ছিলেন। হঠাৎ করে কিভাবে ডাক্তার যাওয়াহিরী দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র আমীর দাবি করে বলল, দাওলাহ'র মূল আমীর হচ্ছে মোল্লা ওমার! এর চেয়ে বড় সাফাহাত আর কী হতে পারে—যার পূর্বের এবং পরের বক্তব্য সাংঘর্ষিক?!

এমন ব্যক্তি কি সাফীহ নয়, যে নিজের সৈনিকদের হত্যাকারীর বিপদাপদ দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করে। যেমনটি করেছিল তাগুত মুরসীর ক্ষেত্রে।

ঐ ব্যক্তি তো অবশ্যই সাফীহ, যে একটি সেকুলার দলকে সরকার গঠন করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে নিজের সৈনিকদেরকে আদেশ করে। তিউনিসিয়ায় আল-কায়দা বিলুপ্ত হওয়ার দায় কেবলই ডাক্তার যাওয়াহিরীর। আন-নাহদা পার্টি যখন ক্ষমতায় আসে যাওয়াহিরী তখন আল-কায়দার তিউনিসিয়া শাখাকে কোন ধরনের হামলা না করার আদেশ করে। পাশাপাশি সরকার গঠনের জন্য আন-নাহদা পার্টিকে সাহায্য-সহযোগিতা করার আদেশ করে। আন-নাহদা পার্টি যে একটি সেকুলার সংগঠন সেটা স্বয়ং ডাক্তার যাওয়াহিরী স্বীকার করেছেন। আর তিউনিসিয়ার আমীর আবু ইয়াদ সৈনিকদেরকে নাহদা পার্টির হাতে তুলে দিয়ে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লিবিয়াতে পালিয়ে যায়। যাওয়াহিরীর এই সাফাহাতমূলক আদেশের পরে তিউনিসিয়ায় আল-কায়দা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

---

54 লিক্বা আল-মাফতূহঃ আল-হালাক্বাতুস সানিয়াহ

এটা তো অবশ্যই সাফাহাতের অন্তর্ভুক্ত যে, জাতীয়তাবাদী ও সেকুলার দলগুলোর সাথে জোট করে সরকার গঠনের আদেশ করা। যাওয়াহিরী এই কাজটি-ই করেছে লিবিয়াতে, শামে, মালিতে এবং তিউনিসিয়ায়। যাদের লড়াইয়ের ভিত্তি-ই হচ্ছে একটি জাতীয়তাবাদী বা সেকুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তাদের সাথে কিভাবে আল-কায়দা জোট গঠন করে? শাইখ উসামা ﷀ এর জীবদ্দশায় আল-কায়দার কোন শাখাকেই এমন করতে দেখা যায়নি। এটা শাইখ উসামার মানহাজও ছিল না। কারণ শাইখ উসামা জোট করতেন ঈমান ও আক্বীদাহ'র ভিত্তিতে যাওয়াহিরীর সাফাহাত প্রসূত মাসলাহার ভিত্তিতে নয়। ডাক্তার যাওয়াহিরীর এই সাফাহাতের কারণেই আজ শামে আল-কায়দা নিশ্চিহ্নের পথে, নিশ্চিহ্ন হয়েছে লিবিয়া থেকে, হয়েছে তিউনিসিয়ায়। আল-কায়দার এ সমস্ত অপকর্মের পিছনে একটি উক্তি সবসময়-ই লক্ষ্য করা যায় তা হল- এগুলো করা হয়েছে ডাক্তার যাওয়াহিরীর আদেশে বা দিকনির্দেশনায়।

ডাক্তার যাওয়াহিরীর উল্লেখযোগ্য সাফাহাতের একটি হল- ডাক্তার যাওয়াহিরী দাওলাতুল ইসলামের মাঝে বাথ পার্টির সাবেক কিছু অফিসার -যারা শাইখ যারক্বাওয়ী এবং শাইখ আবু আনাস আশ-শামীর কাছে পূর্বের কুফর থেকে তাওবা করেছে - তারা থাকার কারণে দাওলাহ'র নেতৃত্ব শারয়ীসিদ্ধ ও খিলাফাহ শারয়ীসিদ্ধ না হওয়ার অভিযোগ তুলেছে। অথচ স্বয়ং যাওয়াহিরীর শুরাতেই সাইফ আল-আদেলের মত সাবেক মিসরী আর্মির অফিসার রয়েছে। বাথ পার্টির সাবেক অফিসার দাওলাহ'র মাঝে থাকার কারণে যদি যাওয়াহিরীর নিকট দাওলাহ'র নেতৃত্ব শারয়ী দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ হয় তাহলে ডাক্তারের প্রণীত উসুলের (?) আলোকে তার শুরাতে সাইফ আল-আদেল থাকার কারণে তার শুরাও শারয়ী দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ। এমনকি শাইখ আবু সুফিয়ান সাইদ আশ-শেহরী যিনি আলে সৌদের এলিট ফোর্সের একজন সদস্য ছিলেন, তিনি আল-কায়দার ইয়েমেন শাখার নেতৃত্বে থাকার কারণে উসুলে যাওয়াহিরীর আলোকে ইয়েমেন আল-কায়দার নেতৃত্বও শারয়ী দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। বাঙ্গালী আল-কায়দার নেতৃত্বে বাংলাদেশ তাগুত সেনাবাহিনীর সাবেক অফিসার মেজর জিয়া থাকার কারণে উসুলে

যাওয়াহিরী অনুযায়ী আনসার আল-ইসলামের নেতৃত্ব শারয়ী দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ। আমরা জানি যে, মেজর জিয়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত আনসার আল-ইসলামের সামরিক শাখার প্রধান ছিলেন। আর তার অধীনেই বাংলাদেশে আনসার আল-ইসলামের সামরিক কাজ হয়েছে। উসুলে যাওয়াহিরী অনুযায়ী এই অঞ্চলে আল-কায়দার সামরিক কাজগুলো একজন শারীয়াহ বহির্ভূত নেতার অধীনে হয়েছে। এই ধরনের মূলনীতি (?) কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি তার সাফাহাতের দরুন-ই বলতে পারে।

ডাক্তার যাওয়াহিরীর উপর হিকমতের চেয়ে সাফাহাত প্রাধান্য পাওয়ার কারণেই দাওলাতুল ইসলামের বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করেছে যাওয়াহিরী। শামের মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য যখন দাওলাতুল ইসলাম শামে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তখন এই ডাক্তার যাওয়াহিরী দাওলাহ'র অধিকৃত ভূমি ছেড়ে দিয়ে দাওলাহ'কে ইরাকে ফিরে আসার আহ্বান করেছে। আর দাওলাহ তার এই অযৌক্তিক আহ্বানে সাড়া না দেওয়ার কারণে যাওয়াহিরী দাওলাহ'র বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। ডাক্তার যাওয়াহিরীর এই সাফাহাতমূলক অযৌক্তিক বক্তব্যের জবাব দিয়েছিলেন শাইখ আব্দুল মাজীদ আল-হাতারী আর-রিমী[55] ﷀ - তিনি যাওয়াহিরীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "কেন বাকি সংগঠনগুলো ছাড়া কেবল দাওলাহ'কে ইরাকে ফিরে যেতে হবে এবং কেন অন্যান্য সংগঠনের জন্য নিজ দেশে ফিরে যাওয়া আবশ্যক নয়? আপনার এই নাসীহা কেন দাওলাহ ব্যতীত অন্যান্য জিহাদী সংগঠনকে উদ্দেশ্য করে না–যে সংগঠনগুলো হয়তো গণতন্ত্রের শাসনে পথ চলার মনস্থ করে নতুবা উপসাগরীয় সংস্থার সাথে মিত্রতা করে? আর কেনইবা এই সকল সংগঠন যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাবে না?"

শামে সাহওয়াতদের মধ্যে বিভিন্ন মতের ও চিন্তার লোক ছিল। কেউ সেকুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, কেউ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অথবা কেউ নাগরিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লড়াই করছিল, এরা সকলেই

55 আব্দুল মাজীদ আল-হাতারী আর-রিমী হলেন ইয়েমেনের একজন প্রসিদ্ধ সালাফী আলেম। যিনি শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল (হাফিঃ) -এর শিক্ষক এবং তার পিতার বন্ধু।

দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কিন্তু যাওয়াহিরী এই ধরনের দলের সাথেও হাত মিলিয়ে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। দাওলাহ যখন খিলাফাহ ঘোষণা করল তখন সাফাহাতের দরুন যাওয়াহিরী একজন মৃত ব্যক্তির বাইআত নবায়ন করে বিরোধিতা করতে লাগল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যখন সত্যবাদী মুওয়াহহিদগণ খলীফাতুল মুসলিমীনকে বাইআত প্রদান করলেন তখন যাওয়াহিরী খারিজি দমনের স্লোগান তুলে প্রতিটি অঞ্চলে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিল। কিন্তু আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা এই মাজলুম দাওলাহ'কে আল্লাহ-ই সাহায্য করেছেন। তাই তো এই দাওলাহ আজ অব্দি টিকে আছে নববী মানহাজের উপর। এই দাওলাহ টিকে আছে উসামা, আবু মুসআব আর আবু ওমারের মানহাজের উপর।

যে ব্যক্তি কুরাইশদেরকে অপদস্থ করার ইচ্ছা করবে আল্লাহ তাকে অপদস্থ করবেন!

ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ কুরাইশদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদেরকে বিচক্ষণতা দান করেছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একজন কুরাইশী ব্যক্তির দুইজন অকুরাইশী ব্যক্তির সমপরিমাণ শক্তি রয়েছে।" যুহরীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এর মানে কী? তিনি বললেন, বিচক্ষণতা। [আহমাদ মুসনাদে বর্ণনা করেছেন, বুখারির শর্তে সনদ সহীহ] আর বিশেষভাবে নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন রাসুল ﷺ বলেছেন, "যতদিন কুরাইশরা দ্বীন কায়েম করবে ততদিন খিলাফাহ ও শাসন ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে। এ বিষয়ে যে-ই তাদের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" ডাক্তার যাওয়াহিরী ঠিক সে কাজটাই করলেন যে ব্যাপারে রাসুল ﷺ সতর্ক করেছেন, তিনি বলেছেন "যে ব্যক্তি কুরাইশদেরকে অপদস্ত করার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তাকে অপদস্ত করবেন।" নাবী ﷺ আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরাইশদের অপমান করবে আল্লাহ তাকে অপমান করবেন।"

আমরা জানি যে, আমীরুল মু'মিনীন শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ﷾ ছিলেন কুরাইশী, তার মাজলিসে শুরার প্রায় ৩ জন ছিলেন কুরাইশী। যে সাহওয়াতদের পক্ষ নিয়ে যাওয়াহিরী আবু বকর আল-বাগদাদী ও তার সৈনিকদেরকে খারিজি বাগী ও আগ্রাসী শত্রু আখ্যায়িত করেছিল আল্লাহ সেই সাহওয়াতদেরকেই যাওয়াহিরী ও তার শামের দলের উপর আযাব হিসেবে নামিয়ে দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে শামে যাওয়াহিরীর দলকে প্রায় নির্মূল করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকায় নেমেছিল সেই সাহওয়াতরাই। এমনকি যাওয়াহিরী যেই বিশ্বাসঘাতক জুলানীর বাইআত গ্রহণ করে একজন কুরাইশী আমীরকে কষ্ট দিয়েছিল এবং তাকে দোষারোপ করেছিল সেই জুলানীই যাওয়াহিরীকে দুনিয়ার মুসলিমদের সামনে লজ্জিত করেছে। আর এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে যাওয়াহিরীর প্রাপ্ত ফলাফল। কেননা রাসুল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরাইশদেরকে অপদস্ত করার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তাকে অপদস্ত করবেন।"

আল–কায়দা তালেবানের কথা কাজে ভারসাম্য নেই!

প্রকৃতপক্ষে তানযীম আল-কায়দা তাদের দাবি ও কর্মসমূহের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। শাইখ উসামা বিন লাদিন ﷾ এর শাহাদাতের পর কিছু দিন যেতে না যেতেই তানযীম আল-কায়দা শাইখের রেখে যাওয়া মানহাজ থেকে বিচ্যুত হতে থাকে এবং দাবি ও কাজের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। বিপরীতে দাওলাতুল ইসলাম তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত একই মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। দাওলাতুল ইসলামের উমারাগণ কথায় এবং কাজে সত্যবাদী। দাওলাহ তার কথা এবং কাজে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। দাওলাহ'র উমারাগণ আল-কায়দার উমারা তালেবান নেতাদের মত জাতিসংঘের সদস্যপদ কামনা করে না। অথচ তালেবানের অনুগামী ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী তার বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, জাতিসংঘের সদস্যপদ চাওয়াও একটি কুফরি কাজ। প্রিয় ভাই! আপনি দাওলাহ'র মাঝে এমন ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করবেন না–ওয়ালিল্লাহিল ফাদলু ওয়াল মিন্নাহ। বিষয়টি একটু খেয়াল করেন, আমীর জাতিসংঘের সদস্যপদ

চাচ্ছে আর অধীনস্থ ব্যক্তি জাতিসংঘের সদস্যপদ চাওয়া কুফরি (কুফরে আকবার) মনে করছে। একই বিষয় আমীরের কাছে বৈধ আর অধীনস্থ ব্যক্তির কাছে কুফর! আপনি কি চিন্তা করেছেন, কতটা বিপরীতমুখী, কতটা ভারসাম্যহীন আক্বীদাহ! এটা তানযীম আল-কায়দাতেই পাওয়া যায় নবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ রাষ্ট্রের আক্বীদাহ-মানহাজে পাওয়া যায় না। তানযীম আল-কায়দার কর্মপদ্ধতিতে এই ধরনের অসংখ্য ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্য থেকে আরো একটি উল্লেখ করছি। গেল বছর কাতারে অনুষ্ঠিত ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ সফলভাবে আয়োজন করতে পারার জন্য কাতারকে অভিনন্দন জানিয়েছে তালেবান। অপরদিকে আল-কায়দার ইয়েমেন শাখা ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ আয়োজনের জন্য নিন্দা জানিয়েছে। এখানেও চরম বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেল। তবে ব্যাপারটি এখানেই শেষ নয়। তানযীম আল-কায়দা তাদের উমারা তালেবানের মাঝে এ ধরনের বৈপরীত্য ও কুফরি কর্মকাণ্ড দেখেও তালেবানকে বর্জন তো করেইনি এমনকি তালেবানের এই কুকীর্তি উল্লেখ করে নিজেদেরকে এর থেকে মুক্ত ঘোষণাও করেনি। তালেবানকে বর্জন ও তালেবানের কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত ঘোষণা করার বদলে তারা তাদের আনুগত্যে লেগে আছে এবং তাদের উচ্চপ্রশংসায় লিপ্ত আছে। প্রিয় পাঠক! আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, কারা দাবি এবং কাজে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি? আমরা আশাকরি বুঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, দাবি এবং কাজে তানযীম আল-কায়দা ভারসাম্য রক্ষা করেনি এবং তাদের মানহাজ বিকৃত হয়েছে। যেমনটা আমরা জানতে পারি আমাদের সম্মানিত শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী ﷺ এর বক্তব্যেঃ তিনি বলেন, "অবশ্যই তানযীম আল-কায়দার নেতারা সঠিক মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আমরা এ ব্যাপারে বলছি অথচ কষ্ট আমাদের মর্মমূলে আঘাত করছে আর আমাদের অন্তর তিক্ততায় পূর্ণ। আমরা এটা বলছি সকল প্রকার মনোক্ষুণ্ণতা নিয়ে, আর আমরা কতইনা চেয়েছিলাম একথা না বলতে, কিন্তু আমাদের উপর জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমরা সত্য বলব এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবো না। অবশ্যই (তাদের) বদলে যাওয়া ও পরিবর্তন হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে গেল, নিশ্চয়ই বর্তমানের আল-কায়দা জিহাদের আল-কায়দা নয়, সুতরাং এটি আর জিহাদের ভিত্তিও নয়, নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই এর প্রশংসা করে, তাগুতের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব

দেখায়, অর্থ বিকৃতকারী ও পথভ্রষ্টরা এর সাথে নরম নরম কথা বলে। আল কায়দা এখন জিহাদের ভিত্তি নয়, সাহওয়াত ও ধর্মনিরপেক্ষরা এর সাথে একই সারিতে রয়েছে, অতীতে যারা তাদের বিরোধী ছিল, অথচ তারা এখন এর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাদের ফাতওয়া অনুযায়ী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। নিশ্চয়ই বর্তমানে আল-কায়দা জিহাদের ভিত্তি হিসেবে স্থগিত হয়ে গেছে, বরং এর নেতৃত্ব এমন একটি কুড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে যা দাওলাতুল ইসলাম এবং আগত খিলাফাহ'র ধ্বংসকারী পরিকল্পনাকে সহায়তা করছে। তারা তাদের মানহাজ পরিবর্তন করেছে, তারা সন্দেহজনক হয়ে পড়েছে, তারা বিদ্রোহীদের বাইআত গ্রহণ করেছে, তারা মুজাহিদদের মধ্যে বিভক্তি এনেছে, তারা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে যা মুওয়াহহিদদের রক্ত ও খুলি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যে দাওলাহ'র প্রশংসা ও সমর্থন করেছে সকল জিহাদের নেতারা, এবং তারা এর বৈধতা বছরের পর বছর বজায় রেখেছে গোপনে ও প্রকাশ্যে, এমনকি তারাও যারা এর বিরুদ্ধে আজকের দিনে যুদ্ধ করছে। এটা এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যখন তারা দাওলাহ'র আমীর ও সৈনিকদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করত এবং এর উপকারিতা স্বীকার করত এবং নিকট অতীতকে স্বীকৃতি জানাতো যা প্রত্যেক মুসলিমের কাঁধে ঋণ হয়েছিল। কী পরিবর্তন হয়েছে? আমীর একই, নেতৃত্ব একই, সৈনিক একই এবং মানহাজও একই!"[56]

তালেবান আল-কায়দা টার্গেট পরিবর্তন করেছেঃ

কুরআন-সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ আক্বীদাহ-মানহাজ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সাথে সাথে তালেবান আল-কায়দা নিজেদের টার্গেট পরিবর্তন করে ফেলেছে। দাওলাহ'র অনেক বিরোধীরাও টার্গেট পরিবর্তন করেছে। যেমন আল-জাজিরা চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জুলানী বলেছে যে, ডাক্তার তাকে সিরিয়ায় আমেরিকার লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাতে নিষেধ করেছে। তাহলে টার্গেট পরিবর্তন করেছে আল-কায়দা এবং

56 এটা আমাদের মানহাজ নয় এবং কখনো ছিলও না।

তালেবান। এছাড়াও পূর্বে গত হওয়া আমাদের আলোচনা থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। তালেবান পূর্বে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে আর এখন তারা আমেরিকার নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে নিজ দেশে কাজ করছে। শুধু তাই নয়, বরং আফগানিস্তানে সাধারণ মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা সালাফী মতাদর্শের তাদের অনেককে হত্যা করে বিভিন্ন স্থানে ফেলে রেখেছে। সালাফী মাদারিসগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিশুদ্ধ আক্বীদাহ'র মুসলিমরা সেখানে অনিরাপদ। কিন্তু মুশরিক রাফিদীরা, শিখরা, খ্রিষ্টানরা সেখানে নিরাপদ। সাহাবীদের তাকফীর করা, লা'নত করা এবং আম্মাজান আয়িশা رضي الله عنها কে অপবাদ দেওয়ার মত জঘন্য কাজ করার পরেও তারা তাদের শিরকী রীতিনীতি পালনের জন্য নিরাপত্তা পায় আর সালাফী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আজ তালেবানের টার্গেট পরিবর্তন হয়ে গেছে, তারা মুসলিমদের হত্যা করছে আর কাফিরদের ছেড়ে দিচ্ছে। আর তালেবানের অনুসারী আল-কায়দাও টার্গেট পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারা মুওয়াহহিদ মুজাহিদগণকে খারিজি অপবাদ দিয়ে অন্যান্য আসলী কুফফার এবং মুরতাদ শাসক ও গোষ্ঠীগুলোর সাথে যুদ্ধ করার থেকে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আল-কায়দা টার্গেট পরিবর্তন করেছে, কারণ তারা মুরতাদদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে যেমন- শাম, লিবিয়া এবং অন্যান্য স্থানে। আল-কায়দা টার্গেট পরিবর্তন করেছে; তারা আরব বসন্ত পরবর্তী তাগুত সরকারগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। প্রিয় ভাই! আপনি বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন! মুসলিম নামধারী দেশগুলোর শাসকদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করা উচিৎ ছিল আল-কায়দার। কিন্তু আল-কায়দা তাদের টার্গেট বদলে ফেলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। তারা শুধু মুখেই আমেরিকাকে টার্গেট বানানোর কথা বলে কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলে। যেমন - যাওয়াহিরী জুলানীকে বলে দিয়েছে যেন আমেরিকাকে লক্ষ্যবস্তু না বানায়। আসলে এইসবই তাদের দ্বিমুখী নীতি। আল-কায়দা তাদের বক্তব্য আর সারগর্ভহীন বিবৃতির মধ্যেই আমেরিকাকে টার্গেট বানানো সীমাবদ্ধ রেখেছে। আল-কায়দার বোকা সমর্থকরা বিষয়টি অনুধাবনের ক্ষমতাও রাখে না (আল্লাহ তাদের সঠিক বুঝ দান করুন)।

দাওলাতুল ইসলাম তার টার্গেট পরিবর্তন করেনি—আল্লাহর অনুগ্রহে। দাওলাতুল খিলাফাহ এগিয়ে চলছে সুলতান মাহমুদ গজনবী এবং সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মূর্তি সংহারক মাহমুদ গজনবী رحمه الله এর হিন্দুস্থান আক্রমণের পূর্বে নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত দাবিকারী মুশরিক কারামাতীয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা (যারা বাতেনী রাফিদী)। আরো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বাইতুল মাক্বদীস বিজয়ী সালাহউদ্দীন আইউবী رحمه الله এর কর্মপদ্ধতি। তিনি ফিলিস্তিনে খ্রিষ্টানদের আক্রমণের পূর্বে কুফফারদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী নামধারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের নির্মূল করে তারপরই তিনি বাইতুল মাক্বদীসের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। বারাবরই মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে তারা কাফিরদের রক্ষা করার জন্য মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে গেছে। এর ধারাবাহিকতা বর্তমানেও বিদ্যমান। এজন্যই দাওলাতুল খিলাফাহ **-أعزها الله-** সালাহউদ্দীন আইউবী رحمه الله এর কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা সাজিয়েছে যে, আমাদের প্রধান টার্গেট হল আসলী কুফফার তথা ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি কুফফাররা। আর যারাই এদের পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদের জন্য বাধা সৃষ্টি করবে মুসলিমদের মধ্য থেকে—তাদেরকেও টার্গেট করা হবে। তাদেরকেও টার্গেট করা হবে যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। শাইখ উসামা رحمه الله বলেছেন সালাহউদ্দীন আইউবীর কর্মপন্থা অনুসরণ করা ছাড়া ফিলিস্তিন মুক্ত করা সম্ভব হবে না।

তিনি বলেন, “সালাহউদ্দীন শাসকদের এবং তাদের সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যারা ক্রুসেডারদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। যদিও তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলত। কারণ সালাহউদ্দীন জানতেন যে, এই ব্যক্তিরা তাদের এই কর্মের মাধ্যমে এই মহান কালিমার বিপরীত করেছে। আর এটা একটা জানা বিষয় যে, এই সমস্ত সরকার ও দলের সাথে যুদ্ধ করা ব্যতীত ফিলিস্তিনে পৌঁছা সম্ভব নয়—যারা ইহুদীদেরকে বেষ্টন করে আছে এবং আমাদের মাঝে ও ইহুদীদের মাঝে অন্তরায় হয়ে আছে। এ মুহূর্তে অনেক মানুষ চেঁচামেচি

করে বলে যে, আপনারা কিভাবে এমন ব্যক্তিদের হত্যা করেন যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। যদি এই ধরনের ব্যক্তিদের জন্য সালাহউদ্দীনের যামানার ন্যায় ক্ষমতা ও শক্তি থাকত তাহলে তারা অবশ্যই তার মাঝে এবং কুদস মুক্ত করার কার্যকরী পদক্ষেপের মাঝে অন্তরায় হত। তারা এমন লোক যারা বেশ কিছু বিষয়ের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে, তারা তাদের দ্বীনের বিষয় বুঝে না। সাহাবীগণ ﷺ যাকাত দিতে বাধাদানকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন অথচ তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দিত এবং ইসলামের বাকি আরকানগুলো পালন করত।"

আমরা দাওলাতুল খিলাফাহ'র সন্তানেরা আমাদের টার্গেট পরিবর্তন করিনি। এর প্রমাণ হল, একমাত্র দাওলাতুল ইসলামই এখনো নুসাইরীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকে আছে। একমাত্র দাওলাহ'র সৈন্যরাই তাদের ঘুম হারাম করে চলছে আজও পর্যন্ত। নুসাইরীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দাবিদার সেই দলগুলো এখন কোথায়? আজ তারা নেই। সুতরাং দাওলাতুল ইসলাম টার্গেট পরিবর্তন করেনি। তবে যারা আমাদের এবং ক্রুসেডারদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা ব্যতীত আমরা এগিয়ে যাবো কিভাবে? আমরা কুফফারদের সাথে যুদ্ধ করার পূর্বে জিহাদের দাবিদার সাহওয়াতদের সাথে যুদ্ধ করতে খুব আগ্রহী না। কিন্তু বিভিন্ন ময়দানে সাহওয়াতরা আমাদের মাঝে এবং কাফির মুরতাদদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেই যাচ্ছে। তাই তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অনেক ফোকাস দিতে হচ্ছে। তারা যদি আমাদের থেকে বিরত থাকে তাহলে আমরাও বিরত থাকব। এব্যাপারে আমীরুল মু'মিনীন আবু বকর আল-বাগদাদী حفظه الله এর এ বক্তব্য উল্লেখ করছি। তিনি সাহওয়াতদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "আপনারা আপনাদের হিসাব পুনরায় কষে নিন এবং আপনাদের রবের নিকট তাওবা করুন। আপনারা তো আমাদেরকে অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে আক্রমণ করেছেন এবং পিছন থেকে গাদ্দারি করে আমাদের আঘাত করেছেন যখন অল্পসংখ্যক ছাড়া আমাদের সকল সৈন্য ময়দানে ও রিবাতে ছিল। এরপরেও আপনারা আমাদের অল্প শক্তি দেখেছেন এবং আজকের ও অতীতের মাঝে পার্থক্য দেখতে পাবেন। আর আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার

পূর্বে নিরাপদে ঘুরাফেরা করতেন এবং নিশ্চিন্তে ঘুমাতেন। কিন্তু আপনারা যে ভয় আর আতঙ্ক তৈরি করেছেন এর জন্য আপনারা রাত্রি জেগে থাকবেন এবং পাহারা বসাবেন। সুতরাং এই দাওলাহ আপনাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে যেন আপনারা এর থেক দূরে থাকেন। তাহলে দাওলাহও আপনাদের থেকে দূরে থাকবে যেন আমরা সকলে রাফিদী নুসাইরীদের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি। তবে এটা জেনে রাখুন! এই দাওলাহ'র এমন পুরুষ রয়েছে যারা বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে না যাদেরকে দূরের কাছের সকলেই চিনে।"

আমাদের শাইখের বক্তব্যই আমাদের উদারতা ও মহানুভবতার প্রমাণ বহন করে এবং সাথে সাথে আমরা যে আমাদের টার্গেট পরিবর্তন করিনি এরও প্রমাণ বহন করে। এছাড়াও শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী ﷺ সাহওয়াতদেরকে আমাদের এবং ক্রুসেডার ও তার দালালদের মাঝ থেকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পথভ্রষ্টতার অনেক গভীরে পৌঁছানোর পরেও তাদেরকে দাওলাহ'র সামনে বাধা না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আর বিপরীতে আল-কায়দা মালিতে দাওলাহ'র নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের সাধারণ মুসলিমদেরও লক্ষ্যবস্তু বানায়। বারংবার এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সাধারণ মুসলিমদের রক্ত নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে তাদেরকে শায়েস্তা করা দাওলাহ'র কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সাধারণ মুসলিমদের রক্তের প্রতিশোধ হিসেবে দাওলাহ'র বীর সৈনিকেরা আল-কায়দার উপর বেশ কয়েকটি বড় ধরনের অভিযান পরিচালনা করেছেন–আলহামদুলিল্লাহ। এই হামলাগুলো আমাদের টার্গেট পরিবর্তন হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রমাণ নয়। আমাদের কর্মই এর বড় প্রমাণ। আমরা শুধু আল-কায়দার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করি ব্যাপারটা কিন্তু তেমন নয়। দাওলাহ অন্যান্য কাফির মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং আল-কায়দার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে। আর কাফির মুরতাদরা যখন দাওলাহ'র উপর বিমান হামলা চালায় তখনই সাথে সাথে আল-কায়দার মুরতাদ সেনারাও অতর্কিতে পিছন হতে হামলা চালায়। তাদের এহেন ন্যক্কারজনক কর্মের পরে কী খাইরের আশা করা যায়! দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোন নিচু পন্থাই বাদ রাখেনি আল-কায়দা। মিডিয়াতেও দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যত ধরনের অপবাদ দেওয়া যায় সব

ধরনের অপবাদই তারা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে কি আমরা হাত গুঁটিয়ে বসে থাকব যেন তারা আমাদেরকে তাদের ইচ্ছামত হত্যা করতে পারে? তারা কতইনা মন্দ ফায়সালা করে!!

আরেকটি বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করছি, তা হল - আমেরিকাই ইসলামের একমাত্র শত্রু নয়। বরং ইসলামের প্রধান কয়েকটি শত্রুর মধ্যে আমেরিকাও একটি। তাই আমাদের উচিৎ এই বিষয়টি উপলব্ধি করা। আমেরিকা আমাদের প্রধান শত্রু বলে যারা বক্তৃতার মঞ্চ কাঁপায় এবং নিজেদের অনেক পণ্ডিত হিসেবে জাহির করে ২০২১ এর তালেবান ক্ষমতা নেওয়ার কয়েকদিন পরেই কাবুল বিমানবন্দরে হামলা তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে। সেই হামলার পর আমেরিকা জানিয়েছে ২০১০ সালের পর আমেরিকান সেনাদের উপর এটিই বড় হামলা। চিন্তা করে দেখেছেন! দীর্ঘ দশ বছরে তালেবানের বীর (???) যোদ্ধারা আমেরিকার উপর এর থেকে বড় হামলা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়নি। আরো অনেকেই তো ছিল কিন্তু এর থেকে বড় হামলা কেউ পরিচালনা করতে পারেনি। আমেরিকা প্রধান শত্রু এটা একটা চটকদার স্লোগান ছাড়া এর কিছুই বাকি থাকেনি।

দাওলাতুল খিলাফাহ তথা খিলাফাহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালানোকেই প্রধান এজেন্ডা হিসেবে নিয়েছে আল-কায়দা!

আল-কায়দা দাওলাহ'কে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ আরোপ করে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যারা খিলাফাহ'কে বাইআত প্রদান করে তাদেরকে তারা অপবাদ দিতে ভুল করে না। এমনকি যারা খিলাফাহ'র শাসনাধীন ভূমিতে বসবাস করে তাদেরকেও আল-কায়দা অপবাদ থেকে রেহাই দেয়নি। এমনও তথ্য আছে যে, হারাকাতুশ শাবাব অনেক সাধারণ মুসলিমকে জেলে ভরেছে শুধুমাত্র দাওলাহ'র ভিডিও দেখার কারণে। কোন রকম বিরোধিতা এবং সমালোচনা হলেই অনেক বেশি সহিংসতার প্রমাণ দিয়েছে আল-কায়দা। আল-কায়দা এখন দাওলাহ'র বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণাকেই মূল এজেন্ডা হিসেবে নিয়েছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের

বিভিন্ন প্রকাশনাগুলোতে এবং বিশেষভাবে AQIS এর আমীর উসামা মাহমুদের বক্তব্যে ও লেখনিতে। এছাড়াও আল-কায়দার বিভিন্ন নেতাদের লেখনি ও বক্তব্যেও দাওলাহ'র বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালানোর বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। আল-কায়দা তালেবানের অনুসারী, আনসার ও সমর্থক সকলের কাজ একটাই তা হল- তাদের নেতাদের অনুসরণ করে খিলাফাহ রাষ্ট্রের প্রকৃত চিত্রকে নিজেদের মিথ্যাচার ও প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমদের নিকট বিকৃত করে তোলা। আল্লাহ যেন তাদের ষড়যন্ত্রকে তাদের দিকেই ঘুরিয়ে দেন। রাসুল ﷺ এর বিরুদ্ধে মক্কার কাফিরদের ষড়যন্ত্র যেমন বুমেড়াং হয়েছিল তেমনি নবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আল-কায়দার ষড়যন্ত্রও বুমেড়াং হয়ে যাবে–বি-ইযনিল্লাহ।

আল–কায়দা তালেবানের বদৌলতে একটি ব্যর্থ প্রজন্ম তৈরি হয়েছে!

বর্তমান এই সময়টাতে আল-কায়দা তালেবানের বদৌলতে এমন একটি প্রজন্ম তৈরি হয়েছে, যারা হক্বের পথের কঠিন বাস্তবতা সম্পর্কে বেখবর, যারা পূর্বসূরীদের গৌরবোজ্জ্বল পথ ছেড়ে ভ্রষ্টতার চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে। এমন একটি প্রজন্ম দেখছি আমরা, যারা মনে করে বিশুদ্ধ তাওহীদের উপর টিকে থেকে দ্বীন কায়েম করা সম্ভব নয়! যারা বিশ্বাস করে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র মত মূলনীতিতে আপোষ না করে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করা সম্ভব নয়! এমন একটি প্রজন্ম দেখছি আমরা, যারা কবর পূজা, মাজার পূজা, খাম্বা পূজাকে কোন অপরাধ মনে করে না! যারা গণতন্ত্রের ধারক-বাহকদের দ্বীনের রক্ষক মনে করে! সুতরাং তারা ব্যর্থ। তারা অবশ্যই ব্যর্থ কারণ তারা মনে করে যে, কুফফারদের সাথে নমনীয় হওয়া ও আপোষ করা ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় ক্বিতাল চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়! আল-কায়দা তালেবানের বদৌলতে সৃষ্ট এই প্রজন্মটি ব্যর্থ, কারণ তারা রাসুলে আরাবী ﷺ এর শানে কটূক্তিকারী, আম্মাজানের ইজ্জতে কালিমা লেপনকারী, সাহাবীগণকে অভিসম্পাতকারী রাফিদীদেরকে মুসলিম মনে করে! রাসুলের সম্মানে যারা আঘাত

হানে তাদেরকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে দ্বীনী দায়িত্বজ্ঞান করে! তারা ব্যর্থ, কারণ তারা স্রষ্টাকে ক্রোধান্বিত করে সৃষ্টির সন্তুষ্টি তালাশ করে। তারা ব্যর্থ, কারণ তারা মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত হাতে হাত মেলানোকে সফলতা হিসেবে দেখে। তারা ব্যর্থ, কারণ তারা সুদী ব্যাংকের অনুমোদন দেওয়াকে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা ভেবে বসে আছে! তালেবানের বদৌলতে তৈরি এই প্রজন্মটি ব্যর্থ, কারণ তারা যমীনে পরিপূর্ণ শারীয়াহ বাস্তবায়ন করাকে 'ভুল রাজনীতি' মনে করে। এই প্রজন্মটি ব্যর্থ, কারণ তারা বাংলাদেশের তাগুতের সৈনিকদেরকে তাদের ইউনিফর্মের দোহাই দিয়ে ভালো হওয়ার জন্য আহ্বান জানায়! তারা ব্যর্থ, কারণ তারা ICC এর অধীনস্থ ঈমান বিধ্বংসী ক্রিকেটকে মানুষের সামনে অবৈধ হিসেবে প্রচার চালাতে পারে না! আল-কায়দা তালেবানের বদৌলতে তৈরি এই প্রজন্মটি ব্যর্থ, কারণ শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله ইসলামী নামধারী গণতান্ত্রিক দলগুলোকে দাজ্জাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন আর এখন এই প্রজন্ম মনে করছে ইসলামী নামধারী গণতান্ত্রিক দলগুলো তাদের মিত্র! তারা ব্যর্থ, কারণ গণতান্ত্রিক, সেকুলার একটি দল অন্য তাগুত কর্তৃক আক্রান্ত হলে তারা সহমর্মিতা ও সংহতি প্রকাশ করে! তারা ব্যর্থ, কারণ তারা জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারত বিরোধিতাকে প্রমোট করে! তারা ব্যর্থ, কারণ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সাথে সংগঠিত যুদ্ধকে তারা 'ইসলাম প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ' মনে করে! তালেবান আল-কায়দার বদৌলতে একটি ব্যর্থ প্রজন্ম তৈরি হয়েছে, যারা কুফফারদের ভাষায় কথা বলে! (অর্থাৎ কুফফাররা যে শব্দচয়ন করে বা যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোন বিষয়কে মূল্যায়ন করে। যেমন- যারা ওয়ালা-বারা বাস্তবায়নের কথা বলে কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলে কাফিররা তাদেরকে কট্টরপন্থী চিহ্নিত করে। মুসলিমদের লেবাসধারী তাগুত শাসকরাও তাদেরকে খাওয়ারিজ ও বাড়াবাড়ির তকমা দিয়ে থাকে, তালেবানের এই প্রজন্মও এমনটা করে থাকে)। তারা ব্যর্থ, কারণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করবে এমন শর্তের আলোকে চুক্তি করাকে তারা ফাতহে মুবীন হিসেবে দেখে! আল-কায়দা তালেবানের বদৌলতে একটি ব্যর্থ প্রজন্ম তৈরি হয়েছে, যারা জয় এবং পরাজয়কে আসমানী ওহীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সক্ষম নয়! যারা জয় পরাজয়কে কেবলই বস্তুবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিবেচনা করে থাকে ও বস্তুবাদ কর্তৃক নির্ধারিত বিজয় নামক

মরীচিকার পেছনেই নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করে! আল-কায়দা তালেবানের বদৌলতে তৈরি হওয়া এই প্রজন্মটি পরিপূর্ণরূপে ব্যর্থ, কারণ তারা নির্যাতিত মুসলিমদের পরিত্যাগ করেছে। তারা মূতা যুদ্ধের মর্মকথা হৃদয়াঙ্গম করতে অক্ষম। যেখানে রাসুল ﷺ একজন মুসলিমের হত্যার বদলা নিতে পুরোদুস্তর একটা বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন রোমানদের বিরুদ্ধে, আর সাহাবীগণ তিন হাজারের একটি সেনা দল হওয়া সত্ত্বেও ২ লক্ষাধিক রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। আল-কায়দা তালেবানের এই প্রজন্মটি ব্যর্থ, কারণ তাদের আত্মমর্যাদা নেই। প্রিয় পাঠক! আপনারা জানেন যে, খলীফাহ মু'তাসিম বিল্লাহ একজন মুসলিম নারীর আর্তনাদে সাড়া দিয়ে কাফিরদের একটি শহর ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এক বোনকে উদ্ধারের জন্য হিন্দুস্তানে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। অথচ তালেবান রাষ্ট্র ক্ষমতা পেয়ে চীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করছে! যারা উইঘুরে মুসলিমদেরকে জাতিগত নিধনের কাজ করে যাচ্ছে! তালেবানের এই প্রজন্মের গাইরত কোথায় গিয়ে ঠেকেছে! আহ! আফসোস! অবশেষে আবারো বলতে হয় আল-কায়দা তালেবানের বদৌলতে এমন একটি ব্যর্থ প্রজন্ম তৈরি হয়েছে যাদের গাইরত বলতে কিছু নেই! ব্যর্থ এই প্রজন্মের দ্বারা যমিনে আল্লাহর দ্বীনের তামকীন প্রতিষ্ঠার মত বোঝা বহন করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়!

এই ফিতনার যামানায় আমাদের করণীয় কী?

শেষ যামানা ফিতনার যামানা। এই সময়ে ঈমানের উপর টিকে থাকা অনেক কঠিন। রাসুল ﷺ বলেন,"মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তার পক্ষে দ্বীনের উপর ধৈর্যধারণ করে থাকাটা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা ব্যক্তির মতো কঠিন হবে।"[57] তিনি আরো বলেন, "অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় ফিতনা আগমনের পূর্বেই তোমরা সৎকাজের প্রতি অগ্রসর হও। ঐ সময় ব্যক্তি সকাল

57 তিরমযী- সনদ সহীহ

বেলায় মু'মিন থাকবে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যা বেলায় মু'মিন থাকবে সকালে কাফির হয়ে যাবে। মানুষ দুনিয়াবী স্বার্থের বিনিময়ে তার দ্বীন বিক্রি করে দিবে।"[58] আমরা হাদিসের মাধ্যমে জানতে পারি, শেষ যামানা ফিতনার যামানা। যেহেতু শেষ যামানায় ফিতনা অনেক বিস্তৃত হবে। হাদিসে এসেছে ফিতনা হবে বৃষ্টির ফোটার মত–অর্থাৎ ফিতনা অনেক ব্যাপক হবে। আর ফিতনার এমন ব্যাপকতার সময়ে আমাদের করণীয় কী হবে তা রাসুল ﷺ বলে যাবেন না এমনটা হতে পারে না। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমি বললাম, এই কল্যাণের পর আর অনিষ্টতা আছে কি? রাসুল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, জাহান্নামের দরজাসমূহে দণ্ডায়মান আহবানকারী (আহ্বান করবে)। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় বলে দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই চর্মের (স্বজাতি) হবে এবং আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, আমাকে কি আদেশ করেন -যদি আমি সে সময় পাই? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামাআত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আমি বললাম, কিন্তু যদি তাদের কোন জামাআত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, ঐ সমস্ত দল থেকে দূরে থাকবে; যদিও তোমাকে কোন গাছের শিকড় কামড়ে থাকতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ঐ অবস্থাতেই মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছে।"[59] এই হাদিস থেকে আমরা কী নির্দেশনা পাই? হাদিস থেকে শিক্ষা হল- ফিতনার যুগে মুসলিমদের জামাআত এবং খলীফাহ'কে আঁকড়ে ধরতে হবে। বিচ্ছিন্ন হওয়া, আনুগত্য পরিত্যাগ করা কাম্য নয়। কোন মুসলিম যদি আল্লাহর রাসুলের বর্ণিত সমাধানের পথে না হেটে সে তার প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দেওয়াকেই সমাধান মনে করে তাহলে সে নিজেই ফিতনাগ্রস্ত হবে। রাসুল ﷺ ফিতনার সমাধান বাতলে দিয়েছেন আর তা হল ফিতনার যুগে মুসলিমদের জামাআত ও খলীফাহ'কে আঁকড়ে ধরা। সুতরাং যদি কোন মুসলিম দাওলাতুল খিলাফাহ'কে মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং মুসলিমদের জামাআত

58 সহীহ মুসলিম

59 বুখারি মুসলিম

থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে এর মাধ্যমে সে ফিতনায় পতিত হবে। বিভিন্ন অজুহাতে খলীফাহ'র আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে রাখা কোন উপকারে আসবে না। যেমন রাসুল ﷺ এর যামানায় মুনাফিক্বরা আল্লাহর রাসুলের নেতৃত্বে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার ব্যাপারে বলেছিল,

﴿قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ﴾

"তারা বলেছিল, যদি আমরা যুদ্ধ (বলে) জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম।"[60] বর্তমান যুগেও অনেকেই আমাদের এই চলমান জিহাদ এবং ক্বিতালকে বৈধ জিহাদা বা ক্বিতাল মনে করে না। তাহলে তাদের এই বৈধ মনে না করার কারণে কি কুফফারদের বিরুদ্ধে আমাদের এই জিহাদ এবং এই ক্বিতাল অবৈধ হবে? আর যে এই অজুহাতে -'এটা কুরআন এবং সুন্নাহ'এ বর্ণিত জিহাদ না' - জিহাদ থেকে বসে থাকবে সে কি পাকড়াও হবে না? অবশ্যই হবে। তার পাকড়াও হওয়ার কারণ হল - কুরআন এবং সুন্নাহ'র দলিল বিদ্যমান থাকার পরে কে কী মনে করে বসে থাকল সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রিয় ভাই! আল্লাহর রাসুল ﷺ স্বয়ং যে যুদ্ধগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছেন সেগুলোকেও কিছু লোক ছিল যারা জিহাদ এবং ক্বিতাল হিসেবে মেনে নিত না। তাহলে বর্তমান যুগের খিলাফাহ'কে সবাই মেনে নিবে এবং এর আনুগত্য করবে ব্যাপারটা আকাশ-কুসুম স্বপ্নের মত। যে খিলাফাহ'র আনুগত্য থেকে বেড়িয়ে যাবে তার মন্দ পরিণতির ব্যাপারে রাসুল ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে তার মৃত্যু হয় জাহিলিয়্যাতের উপর।"[61] তিনি ﷺ আরো বলেন, "যে বাইআত বিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।" আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন, "তোমাদের অবশ্যই উচিৎ আনুগত্য বজায় রাখা এবং জামাআতের সাথে থাকা। কারণ এটাই আল্লাহর সেই রজ্জু যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। বস্তুত জামাআতের মধ্যে তোমরা যা অপছন্দ কর তা

---

60 সুরা আলে-ইমরানঃ ১৬৭

61 বুখারি ও মুসলিম

বিভক্ত থেকে তোমরা যা পছন্দ করবে তার চেয়ে উত্তম।”[62]

মোদ্দাকথা হল- মুসলিমদের জামাআতের সাথে লেগে থাকা এবং খলীফাহ’র আনুগত্য করা আবশ্যক। আর এটাই ফিতনার যামানায় ফিতনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অন্যতম উপায়। সুস্পষ্ট কুফর দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত মুসলিমদের খলীফাহ’র আনুগত্য চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক।

পরিশিষ্টঃ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! প্রত্যেক যামানাতেই হক্বপন্থিদেরকে বিভিন্ন প্রকারের অমূলক অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। এটা কালের পরিক্রমায় সব যুগেই লক্ষ্য করা যায়; হক্বপন্থিদের সাথে ঘটা এক অবধারিত রীতি। এই অপরিবর্তিত রীতিরই সত্যায়ন পাওয়া যায় ওরাকা ইবনে নাওফেলের বাণী থেকে যা তিনি নাবী কারীম ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, “আপনি যা নিয়ে এসেছেন –এর অনুরূপ যে ব্যক্তিই নিয়ে এসেছে তার সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে।” এভাবেই যুগের পরিবর্তন হয়। নাবী রাসুলগণের পরে তাদের উম্মাতের মধ্যে যারা তাদের প্রকৃত অনুসারী তাদের ক্ষেত্রেও অপবাদ আরোপ এবং প্রোপাগান্ডামূলক প্রচারণার মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। ইরাকে দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কুফফার, মুরতাদরা এবং কিছু মুসলিমরাও দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ’র ব্যাপারে অহেতুক অভিযোগ তুলতে থাকে ও একে অপবাদ দিতে থাকে। পরবর্তীতে আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে অপবাদ ও প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যায়। কুফফার জোট দাওলাতুল খিলাফাহ’র বিরুদ্ধে আদর্শিক যুদ্ধে উলামায়ে সূ’দের ব্যবহার করে থাকে। এই সকল উলামায়ে সূ’রা কুরআন-সুন্নাহ’র বক্তব্যকে আংশিক বা বিকৃতভাবে তাগুতদের মিডিয়াসমূহে উপস্থাপন করে দাওলাতুল খিলাফাহ’র বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের সংশয়-সন্দেহ ছড়ানোর অপচেষ্টা চালিয়ে থাকে। আর তাদের এই কাজের মাধ্যমে তারা শারীয়াহ সম্মত বৈধ খিলাফাহ’কে মুসলিম সর্বসাধারণের নিকট সংশয়যুক্ত করতে

62 ইবনে বাত্তালঃ আল-ইবানাত আল-কুবারা

চায়। আল-কায়দা তালেবানও তাদের নোংরা পদাঙ্ক অনুসরণ করে খুবই চতুরতার সাথে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্তমান দাওলাতুল খিলাফাহ'কে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। এক্ষেত্রে তারা মিথ্যা ও ছলচতুরতার আশ্রয় নিতেও পিছপা হয় না। আমরা আল-কায়দা তালেবানের প্রকৃত বাস্তবতা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। সততার সাথে প্রকৃত অবস্থাকে চিত্রায়িত করেছি কলমের কালির মাধ্যমে। আমরা আশা করছি, আল-কায়দা তালেবানের অনেক কুকীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি–আলহামদুলিল্লাহ। পরিশেষে বলতে চাই, আল-কায়দা তালেবান এই দাওলাতুল খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যতই পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করুক না কেন এবং অপবাদ রটাক না কেন তা এর কোনই ক্ষতি করবে না–বি-ইযনিল্লাহ।

والله خير الماكرين

দাওলাতুল ইসলাম কুফফার জাতিসমূহের ভিতে কম্পন সৃষ্টি করেছে। ত্রাসের সঞ্চার করেছে তাদের অন্তরসমূহে। এ কারণেই আরব-আযমের সকল তাগুতরাই এর ভয়ে ভীত। বর্তমানে চলমান যুদ্ধের ময়দানে পৌত্তলিক ও জাহিলিয়্যাতের মনিবদের হৈইচৈই এবং চেঁচামেচি সত্ত্বেও দাওলাতুল খিলাফাহ টিকে আছে, মিথ্যাবাদী এবং পথভ্রষ্টদের মুখোশ উন্মোচন করে চলছে। দাওলাতুল ইসলাম স্বীয় পন্থায় দৃঢ় বিশ্বাসী, সুদৃঢ় অভিপ্রায়ে এগিয়ে চলছে সম্মুখপানে। রবের সাহায্যের ব্যাপারে নিশ্চিত থেকে নিজ পথেই অবিচল রয়েছে। কুফরের সকল জাতিগোষ্ঠী মিলে একে দুর্বল করতে পারেনি। আল্লাহর প্রশংসায় দৃঢ় থেকেছে যেদিন প্রত্যেক নিন্দিত ব্যক্তি ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী নিস্তেজ হয়ে গেছে। কথায় এবং কাজে তাওহীদের দাওয়াহ আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র ঘোষণা দিয়েছে যেদিন অজ্ঞতার গোলকধাঁধায় হতভাগাদের অধঃপতন হয়েছে। ফলে দাওলাতুল ইসলামই এককভাবে বর্তমান যুদ্ধের অগ্রদূত এবং পরিচালক। দাওলাতুল ইসলামের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যতদিন অতিবাহিত হয়েছে এর ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং কুরবানির বিবরণ দিতে বিস্ময়াভিভূত হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যতদিন অতিবাহিত হয়েছে এর মানহাজ এবং পথচলায় দৃঢ় রয়েছে। এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যতদিন অতিবাহিত হয়েছে খিলাফাহ'র সন্তানেরা সুউচ্চ লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলছে।

দাওলাতুল খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এর বিরোধিতাকারীরা ও সাহায্য বর্জনকারীরা এর কোন ক্ষতি করতে পারেনি–বি-ইযনিল্লাহ। দাওলাতুল খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এর নিকৃষ্ট শত্রুরা ভ্রুকুঁচকে এর প্রকৃত সম্প্রসারণ এবং টিকে থাকার স্বীকৃতি দিচ্ছে। দাওলাতুল খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সত্যবাদী মুওয়াহহিদ মুজাহিদগণের দলসমূহ তাদের বাইআতের উপর অবিচল রয়েছে, জামাআতকে আঁকড়ে ধরেছে এবং আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নার্থে ঐক্যবদ্ধ থেকেছে।

সুতরাং সুসংবাদ গ্রহণ করুন হে মুসলিমগণ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন হে আহলুস সুন্নাহ! আল্লাহর অনুগ্রহে আপনাদের সন্তান খিলাফাহ'র সৈনিকগণ লড়াই বন্ধ করেন নি, ক্লান্ত হননি, বশ্যতা স্বীকার করেন নি। আল্লাহর রাস্তায় চলার পথে তাদের নিকট যে বিপদাপদ পৌঁছে–এর কারণে তারা অক্ষম হয়ে যাননি এবং দুর্বলও হননি।

হে আসমান যমীনের রব! আপনি এই দাওলাতুল খিলাফাহ'কে নববী মানহাজের উপর অবিচল রাখুন! আপনি একে হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন! আপনি একে বরকতময় সুস্পষ্ট বিজয় দান করুন! হে আল্লাহ! সকল কুফফার জাতিগোষ্ঠীর অনিষ্টতা থেকে আপনি আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের দাওলাহ'কে রক্ষা করুন! হে আল্লাহ আপনি এই দাওলাতুত তাওহীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান! হে আল্লাহ সকল প্রশংসা আপনারই জন্য আর আমরা আপনারাই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমরা আল্লাহর কাছে বিনয়াবনত হয়ে বলি, হে আল্লাহ! যারা ইসলাম ও মুসলিমদের কষ্ট দিতে চায় আপনি তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করুন! হে আল্লাহ! যারা মুজাহিদদের ব্যাপারে মিথ্যা ছড়ায় আপনি তাদেরকে প্রত্যক্ষদর্শীদের সামনে লাঞ্ছিত করুন! হে আল্লাহ! যারা খিলাফাহ'র ব্যাপারে অপবাদ রটায় আপনি তাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিন! হে রব! যারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে আপনি তাদের চক্রান্ত তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিন এবং তাদের চক্রান্তেই তাদের ধ্বংস করে দিন! আর আপনি এক্ষেত্রে সক্ষম–আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন!

একটি সংশয় নিরসনঃ

দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি কুফর?

বাতিলপন্থিরা দাওলাতুল ইসলামকে খারিজি প্রমাণ করার জন্য প্রায়শই একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ করে যে, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে দাওলাহ কুফর মনে করে। অর্থাৎ তারা দাবি করে, যারাই দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দাওলাহ তাদেরকে তাকফীর করে–আল্লাহ মিথ্যাবাদিদের ধ্বংস করুন! এক্ষেত্রে তারা দাওলাতুল ইসলামের সাবেক মুখপাত্র শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী رحمه الله এর একটি বক্তব্যের একটি অংশকে কাটছাঁট করে দলিল হিসেবে পেশ করে। আমরা দেখেছি আল-কায়দার খালিদ আল-বাতরাফী থেকে শুরু করে উসামা মাহমুদ পর্যন্ত সকলেই শাইখের বক্তব্যসমূহের একটি বক্তব্যের একাংশ উল্লেখ করে জোরেশোরে প্রচার করে যে, দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে দাওলাহ কুফর মনে করে। তাদের এই দাবি ঐ ব্যক্তিদের দাবির সাথে মিলে যায়, যারা বলে কুরআনে রয়েছে তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না। বরং এক্ষেত্রে আল-কায়দার আমীররা দাওলাহ'র বিরোধিতা করতে গিয়ে তাদের নিজেদের ইলমের ত্রুটির পরিচয় দিয়েছে। এই খালিদ আল-বাতরাফী ও উসামা মাহমুদরা এটাও জানে না যে, কোন খাছ (নির্দিষ্ট) বিষয় কখনো আম (ব্যাপক) হয় না। খাছকে খাছ হিসেবেই রাখতে হয়, সেটাকে আম বানানো যায় না। শাইখ আদনানী رحمه الله এই বক্তব্য দিয়েছিলেন শাম ও লিবিয়ার সাহওয়াতদের উদ্দেশ্য করে। কিন্তু তারা সেই বক্তব্যকে আমভাবে প্রচার করা শুরু করেছে। যাইহোক, যুগে যুগে বাতিলপন্থিদের কর্মনীতি এমনই ছিল। তারা হক্বপন্থিদের বক্তব্যকে বিকৃত করে সাধারণ মুসলিমদেরকে হক্বপন্থিদের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর তাওফীক্ব যে হক্বপন্থিদের সাথেই রয়েছে।

আমরা এখানে শাইখ আদনানী رحمه الله এর পুরো বক্তব্যটি উল্লেখ করব। আসলেই কি তিনি সেখানে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে কুফর বলেছেন নাকি বাতিলপন্থিরা তার উপর অপবাদ রটাচ্ছে। শাইখ رحمه الله বলেন, "এমনিভাবে শাম ও

লিবিয়ার বিভিন্ন দলের সৈনিকদের প্রতি আমাদের আহ্বান নবায়ন করছি, আমরা তাদেরকে আহ্বান করছি, তারা যেন দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বে পুরোপুরিভাবে চিন্তা করে–যে দাওলাহ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করে।

হে ফিতনাগ্রস্থ ব্যক্তি! তুমি এ দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বে চিন্তা করে নাও! দাওলাতুল ইসলামের ভূমিগুলো ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন ভূমি পাওয়া যায় না যেখানে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা হয়।

তুমি চিন্তা কর– যদি তুমি এ দাওলাহ'র থেকে অল্প পরিমাণ ভূমি বা কোন গ্রাম অথবা কোন শহর দখল করতে সক্ষম হও তাহলে সেখানে আল্লাহর বিধানকে মানুষের বিধান দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।

আবার তুমি নিজেকে প্রশ্ন কর: যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান দ্বারা মানুষের বিধান পরিবর্তন করে অথবা যে এই পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে মাধ্যম হয় তার হুকুম কী? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি এর কারণে কুফরিতে লিপ্ত হবে। তাই তুমি সতর্ক হও! কারণ তুমি দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে কুফরে পতিত হবে–তুমি অবগত হও বা না হও।"[63]

প্রথমতঃ শাইখ আদনানী ﷺ এখানে বলেছেন, "এমনিভাবে শাম ও লিবিয়ার বিভিন্ন দলের সৈনিকদের প্রতি আমাদের আহ্বান নবায়ন করছি।" আহ্বানটি ছিল শাম ও লিবিয়ার বিভিন্ন দলের সৈনিকদের জন্য খাছ। কিন্তু ফিতনাগ্রস্থ বাতিলপন্থিরা এটাকে আম (ব্যাপক) বক্তব্য হিসেবে প্রচার করে।

দ্বিতীয়তঃ এখানে শাইখ ﷺ এর বক্তব্যে দুইটি অংশ রয়েছে।

প্রথম অংশটি হল-

"এমনিভাবে শাম ও লিবিয়ার বিভিন্ন দলের সৈনিকদের

63 'হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও' শীর্ষক বক্তব্য

প্রতি আমাদের আহ্বান নবায়ন করছি, আমরা তাদেরকে আহ্বান করছি, তারা যেন দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বে পুরোপুরিভাবে চিন্তা করে–যে দাওলাহ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করে।

হে ফিতনাগ্রস্থ ব্যক্তি! তুমি এ দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বে চিন্তা করে নাও! দাওলাতুল ইসলামের ভূমিগুলো ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন ভূমি পাওয়া যায় না যেখানে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা হয়।

তুমি চিন্তা কর– যদি তুমি এ দাওলাহ'র থেকে অল্প পরিমাণ ভূমি বা কোন গ্রাম অথবা কোন শহর দখল করতে সক্ষম হও তাহলে সেখানে আল্লাহর বিধানকে মানুষের বিধান দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।"

আর শাইখ আদনানীর বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ হল-

"আবার তুমি নিজেকে প্রশ্ন কর: যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান দ্বারা মানুষের বিধান পরিবর্তন করে অথবা যে এই পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে মাধ্যম হয় তার হুকুম কী? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি এর কারণে কুফরিতে লিপ্ত হবে। তাই তুমি সতর্ক হও! কারণ তুমি দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে কুফরে পতিত হবে–তুমি অবগত হও বা না হও।"

সুতরাং প্রথম অংশে শাইখ ﷺ কাজের অবস্থা উল্লেখ করে উক্ত কাজের হুকুম বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অংশে তিনি যে ব্যক্তি উক্ত কাজ সম্পাদন করে তার হুকুম বর্ণনা করেছেন। আচ্ছা, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসিত ভূমি দখল

করে মানব রচিত জাহিলী বিধান দ্বারা শাসন করে অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে মানুষের বিধান দ্বারা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে সহযোগী হয় বা মাধ্যম হয় সেই ব্যক্তির কর্মের হুকুম কি কুফর নয়? এতে কি কেউ সন্দেহ করবে? আর সর্বজনস্বীকৃত যে, দাওলাতুল ইসলামের অধিকৃত প্রতিটি ভূমিতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা হয়। দাওলাহ যখন কোন ভূমির কর্তৃত্ব লাভ করে তখন সেখানে হুদুদ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে শারীয়াহ'র প্রতিটি বিধান বাস্তবায়ন করা হয়। বিপরীতে আমরা শাম ও লিবিয়ার সাহওয়াতদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিগুলোর অবস্থা দেখেছি, না তারা নিজেরা শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছে আর না অন্য কাউকে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করার সুযোগ দিয়েছে। শামের কথাই বলি, শামে সাহওয়াতরা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে। দশ বছর পূর্বে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমির অবস্থা যেমন ছিল আজও তাই রয়েছে। আরবদের প্রণয়নকৃত নাগরিক আইন দিয়ে ভূমি শাসন করছে। আমাদেরকে কি কেউ বলতে পারবে সাহওয়াতরা ইদলিবে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছে? না, তারা শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা তো করেই নি উপরন্তু যে ভূমিগুলো শারীয়াহ দ্বারা শাসিত হত সেই ভূমিগুলো তুর্কী তাগুতের সাহায্যে দখল করে সেখানে নাগরিক আইনের মত গায়রুল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করেছে। আর লিবিয়ার অবস্থা তো আরো ভয়াবহ। আল-কায়দা খলিফা হাফতার ও অন্যান্য সেকুলার জাতীয়তাবাদী সাহওয়াত গোষ্ঠীর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা তাগুতদের বিমান হামলার সাহায্যে যে ভূমিগুলো দাওলাহ'র থেকে দখল করেছে সেগুলোতে কি অদৌ শারীয়াহ'র বিধান প্রতিষ্ঠা করেছে? লিবিয়ার আল-কায়দা আজ কোথায়? সাহওয়াতদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে গিয়ে তারা আজ বিলিন হয়ে গেছে। সুতরাং শাইখ আদনানী رحمه الله এমন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যারা আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসনকারী দাওলাহ'র ভূমি দখল করে সেখানে আল্লাহর বিধানকে মানুষের বিধান দ্বারা পরিবর্তন করে। শারীয়াহ'তে এমন ব্যক্তির হুকুম স্পষ্টতই কুফর।

অতএব শাইখ আদনানী رحمه الله কেবলমাত্র দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেই কুফর বলেন নি। তিনি এমন দল বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ কথা বলেছেন, যে দল বা

ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে মানুষের বিধান দ্বারা পরিবর্তন করে অথবা এক্ষেত্রে সহযোগী বা মাধ্যম হয়। আর দাওলাহ'র মানহাজ এটাই। দাওলাহ এই ধরনের দল বা ব্যক্তিদেরকে ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে। আর স্বভাবতই ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র হুকুম হচ্ছে কুফর ও রিদ্দাহ।

আর যে দল নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিতে পরিপূর্ণরূপে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করে পাশাপাশি কাফিরদের সাথে ওয়ালা করা থেকে বিরত থাকে এবং সাহওয়াতদের সাথে জোটবদ্ধ হয় না ও তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে, সেই দল যদি দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দাওলাহ এমন দলকে বাগীর হুকুমে গণ্য করে। দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়ালি মিডিয়া আল-বায়ান রেডিও থেকে এব্যাপারে একটি অডিও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "যদি সেখানে এমন কোন দল থাকে যে দল শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে, সাহওয়াত জোটের বাইরে অবস্থান করে, এ জোট থেকে মুক্ত থাকে, এর থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে ও এর সাথে শত্রুতা করে, সাহওয়াত জোটকে সহযোগিতা করে না ও এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, এর খন্দকে অবস্থান করে না এবং এর কোন ফ্রন্টের জন্য নিবেদিত হয় না ও কেবল মুসলিমদের সাথে ওয়ালা করে, আর উক্ত দল দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই অভিযোগে যে, দাওলাহ জুলুমকারী তাহলে সেই দলের হুকুম হচ্ছে বাগী।"[64]

আর দাওলাহ'র বিরুদ্ধে কেবলমাত্র যুদ্ধ করার কারণে যদি দাওলাহ কাউকে তাকফীর করত তাহলে আল-কায়দার ইয়েমেন শাখাকে সেই ১৪৩৫ হিজরীতেই তাকফীর করত। কিন্তু আল-কায়দা খারিজি ফিতনা (!) দমনের স্লোগান তুলে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে ইয়েমেন, মালি ও সোমালিয়াতে যুদ্ধ শুরু করার পরেও দাওলাহ তাদেরকে তাকফীর করেনি। দাওলাহ তাদেরকে কখন তাকফীর করেছে, যখন তারা বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী দলের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে

---

64 'হাল-মুহারিবাতুল খিলাফাতি রিদ্দাহ' শীর্ষক শিরোনামে আল-বায়ান থেকে প্রকাশিত অডিও বিবৃতি।

এবং সাহওয়াত গোষ্ঠীর পক্ষ নিয়ে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তখন দাওলাহ তাদেরকে তাকফীর করেছে। তাও আবার তাকফীর করেছে ১৪৪০ হিজরীতে। আল-কায়দা তো খারিজি ফিতনা (!) দমনের নামে ইয়েমেন, মালি ও সোমালিয়াতে যুদ্ধ শুরু করেছে ১৪৩৫ হিজরী থেকে, তাহলে দাওলাহ কেন আল-কায়দার এই শাখাগুলোকে এই কয়েকবছর যাবৎ তাকফীর করেনি! কেন এই কয়েকবছর পর তাকফীর করেছে! কারণ দাওলাহ'র বিরুদ্ধে কেবল যুদ্ধ করলেই কেউ কাফির হয়ে যায় না। বরং যে সমস্ত দল ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মত কর্ম সম্পাদন করার সাথে সাথে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দাওলাহ সেই সমস্ত দলকেই তাকফীর করে।

والحمد لله رب العالمين





مؤسسة الصوارم

As Sawarim Media

